মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সার্বিক বিপ্লব

জয়প্রকাশ নারায়ণ

সম্পাদনা : সজল বসু

জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মোৎসব কমিটি
পরিবেশক
সেলস এ্যালায়েন্স
৭-বি, লেক প্লেস, কলকাতা-২৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১২৬৩

ভাষান্তর : সজল বসু, ভবানী চট্টোপাধ্যায়, মিত্র কৌটিল্য

জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মোৎসব কমিটির পক্ষে দিলীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৩৫-বি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত এবং প্রভাবতী প্রেস, ৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলকাতা-৬ থেকে সনাতন হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ নিজের কথায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৫১ পাটনায় এক সাক্ষাৎকারে নিজের সম্বন্ধে জয়প্রকাশ মন্তব্য করেন : আমার সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী দেশের ও মানুষের সেবা করতে চেষ্টা করেছি। ··আমি একজন নগণ্য মানুষ, সাধারণ ভারতীয় নাগরিক, দেশের জন্য যা করা কর্তব্য মনে করেছি, তাই করতে চেষ্টা করেছি। তেমন কোনো স্মরণীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা নেই আমার জীবনে। জানি না আমায় কেউ মনে রাখবে কি না। এ ত ইতিহাসের বিচার্য বিষয়, নিজস্ব গতি ধরেই ইতিহাস এগোয়। শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমার বিশ্বাস-মতাদর্শ বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে গেছি, এবং দেশের কাছে, জাতির কাছে ও নিজের কাছে আমি সৎনিষ্ঠ থাকতে চেষ্টা করেছি।"

এই স্বীকারোক্তি জয়প্রকাশ সমালোচকদের সন্তুষ্ট করবে কি জানি না। তাদের চোখে জয়প্রকাশ একজন কনফিউজড্ ম্যান, বিভ্রান্ত, পরস্পরবিরোধী অস্থিরমতি ব্যক্তিত্ব। মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজবাদ থেকে সর্বোদয় পরিক্রমা অন্তে সার্বিক বিপ্লবের ভাবনা হয়ত অনেকের কাছেই ছন্দহীন বেসুরো মনে হতে পারে। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে জয়প্রকাশ ভিন্ন পদ্ধতি ও নানা কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেও সামাজিক সারবস্তুতে তা ছিল অভিন্ন। এই ভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও অভিন্ন মতাদর্শের রূপরেখা তুলে ধরার জন্যই এই সংকলন। বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি অবশ্যই জয়প্রকাশ চিন্তাধারার সার্বিক উপস্থাপনা হতে পারে না, তার অবকাশ এই স্বল্প পরিসরে থাকতে পারে না। তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নানা রূপান্তর ও প্রবাহের পটভূমি সংকলিত লেখাগুলিতে পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে, তিনি কেন কট্টর মার্কসবাদী হয়েও জনমানসের নাড়ি স্পন্দন অনুভবকারী গান্ধীর কর্মকৌশলে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাজনীতিব সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ অতিক্রমণে কেন সর্বোদয়ের মাধ্যমে লোকজীবনকে প্রভাবিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

"গান্ধীজীর জীবদ্দশায় ধীরে ধীরে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারিনি কেমন করে অহিংস কলা-কৌশলের দ্বারা সমাজবিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। ঐ কৌশলের কর্মপদ্ধতি আমি জাতীয় বিপ্লবের সময় দেখেছি। কিন্তু কি উপায়ে কেমন করে সামন্ততন্ত্র ও ধনবাদের বিলোপ সাধন করা যায়

এবং নতুন সমাজ গঠন করা যায়, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।… গান্ধীজীর তিরোধানের সময় আমি মার্কসবাদ থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছি। তথাপি আমি মেনে নিতে পারিনি যে অহিংবাদ ব্যক্তিগত আচরণ থেকে স্বতন্ত্র সামাজিক আচরণের আদর্শ হতে পারে।"

"প্রত্যেকেই নিজ পটভূমি থেকে সবকিছু দেখেন। আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা যারা করেন নি, আমার আদর্শ যাঁরা অনুসরণ করেন না, তাঁদের পক্ষে এই যুক্তি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। আমি মনে করি না যে সামাজিক সমস্যার ত্রুটিহীন সমাধান পাওয়া গেছে, অথবা সর্বোদয়ই সমাজবিজ্ঞানের শেষ কথা" (সমাজবাদ থেকে সর্বোদয়)।

এই জয়প্রকাশই আবার বলেছেন: আমার মনে হয় তিনি (বিনোবা ভাবে) সমাজ পরিবর্তনে তাঁর অন্য সব কাজকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে রেখেছিলেন, এবং এটাই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। সমাজে কোন শক্তির জন্ম তিনি দিতে পারেন নি। সর্বসেবা সংঘ আছে বটে, কিন্তু সর্বসেবা সংঘ রাজনীতি করবে না, এই কথা বলে তিনি একে সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হতে দেন নি।" (J. P Profile of a Non-Conformist : Bhola Chatterjee).

"মানুষ স্বধর্ম বশে সত্য পিপাসু। সে ক্রমাগত সত্যের দিকে ধেয়ে যায়। পরমতম সত্যে সে কখনও পৌঁছতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে অসত্য পরিহার করে চলতে চলতে সে সত্যের সমীপবর্তী হয়।" এই জন্যই ব্যক্তির মতোই ইতিহাসও সীমাবদ্ধতায় বদ্ধ। মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা এই সীমাবদ্ধতার জনক। ইতিহাসও ব্যক্তির মতো অসত্যের কুয়াশা ভেদ করতে প্রয়াস করে। সেজন্যই দেশ-কালের আধারে রেখে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সহজ নয়।

বারংবার মতাদর্শ অনুক্রমণ, রাজনীতি থেকে লোকনীতিতে প্রবেশ এবং রাজনীতিকে লোকজীবনমুখী করার প্রয়াসের মধ্যে জয়প্রকাশের সার্বিক চিন্তাধারার আভাস মেলে। সেই অর্থে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হননি, বরং প্রকৃত অর্থে সমাজ রূপকার হয়ে উঠতে চেয়েছেন। যেমন আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে, কবি দার্শনিক হয়েও তিনি সমাজ গঠনের ছবি এঁকেছেন, তা বাস্তবে কার্যকরী করতে চেয়েছেন। মার্কসবাদে দীক্ষা, অহিংসা অসহযোগে আকৃষ্ট হওয়া গণতান্ত্রিক সমাজবাদী হওয়া, সর্বোদয়ী হয়ে

কাশ্মীর সমস্যা থেকে শুরু করে চম্বল ডাকাতদের আত্মসমর্পণ বা নাগা সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া, নকশাল বন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা, সব ক্ষেত্রেই এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা বৈপরীত্য নেই। যিনি রাজনীতির দিশা দেবেন তিনি সামাজিক সাংস্কৃতিক ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা হবেন না? অথবা যিনি সমাজসেবক হবেন তিনি রাজনৈতিক অধোগতির নিরসনে প্রয়াসী হবেন না! সর্বোদয়ে ব্যাপৃত হওয়ার পর জয়প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়েছিলেন, এ নিয়ে বহু মন্তব্য হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে ঐসব ক্ষেত্রে তাঁর কী বিরাট অবদান।

"স্বাধীনতার আঠাশ বছর পরেও এ-দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর কোন প্রকৃত পরিবর্তন আসে নি। জমিদারী লুপ্ত হয়েছে, ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে, অস্পৃশ্যতা কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু গ্রাম, যা আসলে খাঁটি ভারতবর্ষ, সেখানে গরীবরা এখনো উচ্চবর্ণের লোক আর বড় মাঝারী ভূস্বামীদের দ্বারা নিপীড়িত।...সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্রটি ভয়াবহ। শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। যা কিছু নিম্নতম প্রয়োজন—খাবার জল, খোঁয়াড় নয়, মানুষের বাসযোগ্য একটি বাড়ি এসব কিছুই নেই।"

"প্রশ্ন এই, সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে কি এই নৈরাশ্যজনক চিত্রটি মৌলিকভাবে পাল্টানো যায়? আমার তা মনে হয় না।... এই সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তন কোন্ পথে আসবে? (কারাবাসের কাহিনী)

"বিপ্লব বিপ্লবীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য সামাজিক পরিস্থিতি হওয়া চাই।...বিপ্লবকে না লেনিন সৃষ্টি করেছেন, না মাও, না গান্ধী। বিপ্লব পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট হয়।"

"অনেকে বলেন, হিংসা ছাড়া কায়েমী শক্তির উচ্ছেদ করা যাবে না, বিপ্লব হবে না। ভারতে হিংসায় বিশ্বাসীরা তেলেঙ্গানার রক্তপাতের সময় হতেই বিপ্লবের প্রয়াস করেছেন। কিন্তু ৩৬ বছরে তারা কতদূর এগিয়েছেন?

দুনিয়ার যত সহিংস বিপ্লব হয়েছে দেখা গেছে বিপ্লব হয় জনতার নামে, কিন্তু জনতার বুকের ওপর বসে রাজত্ব করেন ডিকটেটররা।... অহিংস বিপ্লবে পুরানো সমাজ পরিবর্তনের কাজ ও নতুন সমাজ গড়ার কাজ একই সাথে চলতে থাকে। বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক বিপ্লবের অর্থ গ্রাম

থেকে শহরের কেন্দ্র অবধি সর্বাত্মক পরিবর্তন" (জয়প্রকাশ : সার্বিক বিপ্লব কী ও কেন ; স্বদেশে সমাজবাদ : (সঃ) সজল বসু)

এমনতরো যেসব ধারণা ও বক্তব্য জয়প্রকাশ ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে পরিবর্তন বিরোধী, অসমঞ্জস কিছু আছে কী? চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আচরণ, ভারতে মার্কসবাদী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ কী প্রমাণ করেনি যে সহিংস বিপ্লববাদীরা আদতে নব্য স্বৈরতন্ত্রের ধারকবাহক। রাজনীতির অবক্ষয়ী রূপ কী জনমনে এই ধারণার জন্ম দেয়নি যে আজকের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদেরা আসলে জনতার শোষক!

"অর্থ, সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রচারের সাহায্যে দলগুলি জনসাধারণের উপর নিজেদের চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়। জনতার রাজ কার্যতঃ দলের শাসনে পরিণত হয় এবং দলীয় শাসন রাজনৈতিক দলের মতলববাজ ছোট্ট একটি গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়ে।"

"দলীয় প্রথা জনগনকে নির্বীর্য করে তুলেছে। স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় কিম্বা নিজেদের কাজকর্ম গুছিয়ে করবার ব্যাপারেও দলীয় প্রথা থেকে তারা কোনো সাহায্য পায় না।··· দলীয় প্রথা মানুষকে ভেড়া বানাচ্ছে। তাদের একমাত্র কাজ হল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একজন মেষপালক নির্বাচন করা।"

"গণতন্ত্রবাদী সমাজতন্ত্রীগণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের চার স্তম্ভ ও সমধর্মী ধারণার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্যতঃ ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে তারা আগের মতোই সংশ্লিষ্ট। তাদের ধারণা ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি দখল করার পরই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। এই পন্থার অসংগতি তাদের নজরে পড়ে না" (সমাজবাদ থেকে সর্বোদয়)।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের যেসব ধারণা প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে, জয়প্রকাশের মতাদর্শে তার সুর নিহিত রয়েছে। শুখামের-এর ছোট্টই সুন্দর, অথবা অর্থনীতিবিদদের বিকল্প প্রযুক্তির তত্ত্ব (অলটারনেটিভ টেকনোলজি), বড় শিল্পগুলিতে বর্তমান মিশ্র ব্যবস্থা বজায়, গৃহ উদ্যোগে পারিবারিক মালিকানা, বড় শিল্পে শ্রমিক ট্রাস্ট গঠন সম্বন্ধে জয়প্রকাশের ধারণা আধুনিক অর্থনীতি-বিদদের সমধর্মী। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানা আসতে জনগণের ওপরই বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সেজন্য যুগোশ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণের কথা তিনি বলেছেন। রাজনৈতিক স্তরে আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির দাপটের মোকাবিলায় জন্যই লোকশিক্ষা ও লোকশক্তির ওপর জোর দিয়েছেন।

রচনা ও সংঘর্ষের দ্বিমুখী কার্যক্রম ছাড়া এ দুইয়ের উদ্ভব সম্ভব নয়। রচনা ও সংঘর্ষের ওপর গুরুত্ব এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে চলার নীতি কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট আমল থেকে সম্পূর্ণ ক্রান্তির সময়কাল পর্যন্ত পরম্পরাযুক্ত ছিল। জয়প্রকাশের মতাদর্শ ও রাজনীতির মধ্যে যারা অসঙ্গতি খোঁজেন বা discontinuityর কথা বলেন, তারা বোধহয় এইসব সারবস্তুর বিচার না করেই সমালোচনা করেন। কুপ্রথার অবসান ও জাতিবাদ উচ্ছেদ, জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন অমান্য সত্যাগ্রহ, গণআন্দোলন, রাষ্ট্রশক্তির বিকল্পে লোকশক্তি গঠন, এ সব ধারণাই ভারতের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের গর্ভ থেকে উদ্ভূত। জয়প্রকাশ কোনো পর্যায়েই এই ধারা থেকে বেড়িয়ে যান নি। সমাজের যে স্তরেই তিনি কর্মে ব্যাপৃত থাকুন না কেন, ঐ সামগ্রিক বিচারধারা অনুসারেই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস করেছেন।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলিতেও এই পরম্পরার সুর অনুরণিত। মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র কেন চাই, সমাজবাদ : মত ও পথ, গণ-আন্দোলন, সম্পূর্ণ ক্রান্তি এই পাঁচটি লেখার মধ্য দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের চিন্তাধারা তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। তাঁর জীবনব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ, স্বকীয় রাজনীতি ও দেশকাল সম্পর্কে অনুধ্যান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মূল্যায়ন, ভারতের সমাজবিন্যাস বিচার, সমতার প্রেক্ষাপট সামনে রেখে লোকশক্তি বিকাশের পথ অন্বেষণ কীভাবে এক আদর্শ থেকে ভিন্নরূপে নব উত্তরণে সহায়ক হয়েছে, তার আভাস মিলবে এই লেখা-গুলিতে। অথচ সব পর্যায়েই তাঁর এই পথ পরিক্রমায় সারবস্তু ছিল গণতন্ত্র, অহিংসা, সমাজতন্ত্র, স্বশাসন, মানবিক আধ্যাত্মিকতা, লোকনীতি। লক্ষ্য ছিল সেই সমাজ 'যেখানে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে, ব্যক্তি বাঁচবে সমাজের জন্য, সমাজ বেঁচে থাকবে ব্যক্তির জন্য'।

এই আদর্শ সমাজ গঠনে জয়প্রকাশ কেতাবী রীতি অনুসারে সংগঠিত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত বিপ্লবী, বা বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলেন নি। বরং তাঁর মতে, এলিট শ্রেণী বা ভদ্র সমাজের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ক্রান্তির চিন্তাধারা থেকে একেবারেই পৃথক, জীবন দৃষ্টিতে মৌলিক প্রভেদ। "আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমী ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতির বিচারে সব কিছুর মূল্যায়ন

করেন।" সমাজকে পরিশুদ্ধ করে ব্যবস্থা পরিবর্তন বা changing the system from within তাদের ভাবধারায় বোধগম্য নয়। মানবতাবাদী সমতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ পুনর্গঠনে তিনি আগ্রহী। পরিবর্তনের নিরন্তন প্রক্রিয়ায় গণসংগঠন ও লোকনীতিই হবে এর মাধ্যম। "তার সোধ উপর থেকে নয়, নীচ থেকে নির্মিত হবে। দিল্লী থেকে নয়, গ্রামগুলি থেমে মহল্লাগুলি থেকে তার ইট গাঁথা হবে।" এই কাজে যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, "হৃষিকেশ যখন জীবনের কুরুক্ষেত্রে অনুপম অধ্যাত্মের পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাজিয়েছিলেন তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন যুবক।… নিজের প্রিয়তমার কোলে নবজাত রাহুলকে ঘুমন্ত অবস্থায় ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন অদ্বিতীয় সাংস্কৃতিক ক্রান্তির পথে বেরিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তরুণ।" (দ্রঃ সম্পূর্ণ ক্রান্তি)।

"ইগনাৎসিও সিলোন বলেছিলেন : কিছু তত্ত্বের সমষ্টির ওপর একটা স্কুল করা যায়, কিন্তু কিছু মূল্যবোধের মধ্যে পাওয়া যায় একটি সংস্কৃতিকে, এক সভ্যতাকে, মানব সমাজে বসবাস করার এক নতুন জীবনরীতি।' সমাজবাদ শুধু চিন্তাধারাই নয়, এ এক নব সংস্কৃতি, নব সভ্যতার ধারক।" জয়প্রকাশ একথা বলেছিলেন ১৯৫১ সালে, মাদ্রাজে পার্টি সম্মেলনের ভাষণে।

১৯১৮ সালে জয়প্রকাশ বলছেন : সবকিছুর পরিবর্তন চাই, প্রথমে চাই মানুষের পরিবর্তন।…ইতিহাসে এমন দেখা গেছে যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হলে—তার মূল উৎস যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক, শ্রেণী-সংকট অথবা অন্য কিছু—একবার বৈপ্লবিক প্রবাহ প্রসারলাভ করলে তা সবকিছুকে প্রভাবিত করে, এবং তা সফল হলে পুরনো ব্যবস্থার কিছুই আর আগের রূপে থাকে না।" এই বিরাট সময়ের ব্যবধানে তাঁর মৌলিক প্রতীতীতে কিছুমাত্র পরিবর্তন আসে নি।

মার্কসবাদ, সমাজবাদ, সর্বোদয় হয়ে সার্বিক বিপ্লবে উত্তরণের মধ্যে অসঙ্গতি বা বৈপরীত্য নেই। ভারতীয় সমাজ ও আধুনিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতেই জয়প্রকাশ সমাজ বিপ্লবের নিদান দিয়েছেন স্বকীয় বিচারধারা অনুযায়ী। বর্তমান পরিবর্তিত বিন্যাসে পুঁজিবাদের বিকল্পে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নয়, সপ্তক্রান্তির সমাহারে অর্জিত সমসমাজই লক্ষ্য। সমাজে রাষ্ট্র ক্ষমতারূপ ফুল পল্লবিত হওয়ার চাপে জনগণ শুকিয়ে যাবে না। আজ কি পুঁজিবাদী,

সাম্যবাদী, উদারতন্ত্রী গণতান্ত্রিক সব ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্র শুকিয়ে যাওয়ার বদলে জনগণ শুকিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তি তথা দলতন্ত্রের নিমিত্তমাত্র হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই রাষ্ট্রশক্তি লোকশক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধকই নয়, লোকশক্তি দমনে সংস্থানিক হিংসার (institutional) violence ধারকবাহক। এই অনুভব থেকেই জয়প্রকাশ নারায়ণ সমাজমুক্তির পথ অন্বেষণে বিভিন্ন মতাদর্শে আস্থা স্থাপন করেও ক্রমাগত সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন, সেজন্যই স্বকীয় আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, সাথে সাথে নিজেকেও ভাঙতে প্রয়াসী হয়েছেন। সংকলনে গ্রথিত রচনাগুলিতে জয়প্রকাশ ব্যক্তিত্বের এই প্রতীতীকে গ্রথিত করা হয়েছে।

সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মোৎসব কমিটির সদস্যরাই উদ্যোগী হয়েছেন। বিশেষ করে ঐ কমিটির সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, কোষাধ্যক্ষ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য সর্বশ্রী অভিজিৎ রায়চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী, সন্তোষ রানা, ভজন দাশগুপ্ত, ইন্দ্র ঘোষ, কমল বসু, নির্মল ঘোষাল, সাধন সরকার প্রমুখের সহায়তা উল্লেখযোগ্য। শেষের দুটি লেখা মূল হিন্দী থেকে ভাষান্তরের জন্য শ্রীভবানী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ, দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অনুবাদে মিত্র কৌটিল্যের সাহায্যও উল্লেখ্য।

এক ঃ মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

আমার অতীত জীবন অস্থির অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলার মতো। আমার কালের অধিকাংশ বালকের মতো আমিও অতি উৎসাহী জাতীয়তা-বাদী ছিলাম, বিপ্লবের দিকে ঝোঁকও ছিল। বাংলা তখন বিপ্লব-কর্মের মহান নেতা। তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের কাহিনী তখন আমার যুব-হৃদয়কে মুগ্ধ করেছিল। আমার বৈপ্লবিক প্রবণতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র দেশে একটি বিস্ময়কর ঝঞ্ঝার মত বয়ে গেল। সে সময়ের হাজার হাজার যুবকের ন্যায় আমিও ঝড়ো পাতার মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে সে হাওয়ায় গা ভাসিয়েছি। মহান আদর্শের হাওয়ায় ক্ষণিকের তরে সেই বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, বাস্তবের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও তা মুছে যায় নি। ঐ সময় থেকেই জীবনের দিশারি হয়ে গেছে স্বাধীনতা। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে স্বাধীনতা কেবল স্বদেশের মুক্তিকামনার মধ্যে আবদ্ধ রইল না। তখন তা সব দেশের সকল মানুষের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমার কাছে স্বাধীনতার পরম অর্থ হয়ে ওঠে মানব ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা, মন ও আত্মার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আমার জীবনে এমন আবেগে পরিণত হয়েছে যে, খাদ্য, ক্ষমতা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি বা স্বদেশের গৌরব অথবা যা কিছু হোক না কেন, কোন কিছুর বিনিময়েই সে স্বাধীনতা খর্ব করতে পারি না।

আমি ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সন পর্যন্ত আমেরিকায় বাস করি। আশ্চর্যের কথা এই যে, স্থিতিশীল ঐ দেশে বসেই মার্কসবাদ তথা তৎকালীন সোভিয়েট সাম্যবাদে আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম। প্রগতির তীর্থভূমি তৎকালীন ম্যাডিসন উইসকনসিন-এ বসে ইহুদী ও পাশ্চাত্ত্য সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে একত্রে মার্কসীয় তত্ত্ব গভীরভাবে পাঠ ও অনুধ্যান করেছিলাম। আমার ধারণা, ইংরেজিতে প্রকাশিত মার্কসের যাবতীয় বই তখন আমরা পড়েছি। জনৈক মেধাবী জার্মান ছাত্রের সাহায্যে কিছু জার্মান ভাষায় লিখিত মার্কসীয় ক্লাসিক বইও আমি পড়ি। এম. এন. রায়ের তীক্ষ্ণ লেখাগুলি ইউরোপ থেকে কমিউনিষ্ট

মণ্ডলীতে, বিশেষ করে এশিয়ার ছাত্র সেলগুলিতে পাচার হয়ে আসত। ঐগুলির সাহায্যে সাম্যবাদে আমার দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

স্বাধীনতা তখনই অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য হয়ে রয়েছে। সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য গান্ধীজীর আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা মার্কসীয় বিপ্লব-পদ্ধতি নিশ্চিত ও দ্রুততর পন্থা বলে আমার মনে হয়েছিল। মহান লেনিনের রোমাঞ্চকর সাফল্যের বিবরণ আমরা তখন গো-গ্রাসে গিলতাম—তবুও আকাঙ্খা মিটত না। এমনি করে মার্কসীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মনে মনে একটি সন্দেহাতীত প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল।

সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আলোর ইঙ্গিতও আমি পেয়েছিলাম মার্কসবাদের মধ্যে। স্বাধীনতাই সব নয়। সকলের, এমন কি সবচেয়ে নিচুতে যে, তারও স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতার অর্থ হবে শোষণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি। কি সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা যার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অবচেতন মনে দারিদ্র্য ও দুঃখের জন্য সমবেদনা জাগ্রত হয়েছিল, তা আমি স্মরণ করতে পারি না। হৃদয়ে সুপ্ত সহানুভূতি অবশ্যই ছিল। মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সেটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে এবং জীবনধারণ প্রণালী সচেতনভাবে মার্কসীয় পন্থায় প্রভাবিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আমার জীবনযাপন পদ্ধতি এই বিকাশধারাকে তীব্রতর করেছিল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি, সেখান থেকে তেমন কোন সাহায্য পেতাম না। ফলে কারখানায়, ক্ষেত-খামারে সাধারণ শ্রমিকরূপে কাজ করে আমাকে নিজের ভরণ-পোষণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ব্যয় নির্বাহ করতে হত।

স্বাধীনতার ন্যায় সমতার প্রশ্নও আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত আমি তখন পর্যন্ত বিশেষ জানতাম না। বস্তুতঃ রায়ের (এম. এন রায়) তৎকালীন লেখা (যদিও পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন) থেকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, গান্ধীজী সামাজিক বিপ্লবের বিরোধী এবং সঙ্কটমুহূর্তে শোষণ ও বৈষম্যের সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন। সামাজিক বিপ্লব ও তা ঘটাবার উপায় সম্পর্কে গান্ধীজীর যে স্বকীয় ধ্যানধারণা ছিল তা আমি তখন বুঝতে সমর্থ হই নি।

কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা

১৯২৯ সনের শেষে আমি দেশে ফিরি। সময়টা মার্কসবাদের পক্ষে

অনুকূল ছিল না। জাতীয়তাবাদ তখন প্রবল আবেগে উপস্থিত। কলকাতা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতকে ডোমিনিয়নের পূর্ণ মর্যাদা দিতে লর্ড আরুইনকে গান্ধীজী রাজী করাতে পারলেন না। ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিকে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোবার উপযুক্ত পটভূমি রচিত হয়েছিল। 'পূর্ণ স্বরাজ' জাতীয় আদর্শ বলে ঘোষিত হল। পর বৎসর গোড়ার দিকে মহাত্মা গান্ধী বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। স্বাভাবিক-ভাবে সর্বশক্তি নিয়ে আমি সেই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সেই সমরাঙ্গনের কোথায়ও আমি ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের খুঁজে পাইনি। তাদের কেউ কেউ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অবশ্য কারারুদ্ধ ছিলেন। অনেকেই কিন্তু বাইরে ছিলেন। আর যে রকমেরই হোক না কেন, কম্যুনিষ্টদের গোপন সংগঠনও ছিল। জাতীয় সংগ্রামের জন্য আমি শীঘ্রই আত্মগোপন করি। সেখানেও কম্যুনিষ্টদের দেখতে পাওয়া গেল না। একটি অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা খুব সহজেই এই দুই আত্মগোপনকারীর যুক্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল। এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ঘটেছিল। ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে বুর্জোয়া আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দালাল বলে তাঁরা অভিহিত করলেন। ভ্রান্তি ও লজ্জার সেই পুরো ঘটনাটি আমি এখানে বলতে চাই না। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট ও তাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমার মতভেদটা কোথায় সেটা দেখাবার জন্যই কথাটা এখানে বলতে হল। পুরোপুরি স্টালিনের নেতৃত্বাধীনে এসেছিল তৃতীয় অথবা কম্যুনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশানাল। সেখানে গৃহীত নীতিই ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ অনুসরণ করতেন। ১৯২৮ সন থেকেই কমিনটার্ণ স্পষ্টতঃই ভুল পথ অনুসরণ করে এসেছে। যার ফলে, বিশ্বের সমাজবাদী আন্দোলনে ও শ্রমিক সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন থেকে কম্যুনিষ্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সবই আমার কাছে মার্কসবাদ বিরোধী, বিশেষ করে লেনিন ঘোষিত বিখ্যাত ঔপনিবেশিক নীতির পরিপন্থী মনে হয়েছিল। আমার এই আশঙ্কা পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মতভেদই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আমার গরমিল' ও বিচ্ছিন্নতার সূচনা করে। তখনও আমার নিকট রাশিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সাম্যবাদী দেশ। এর আগে কয়েক বছর ধরে রাশিয়ার আদর্শ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, ও ক্ষমতা নিয়ে যে লড়াই চলছিল তা এক অবাঞ্ছিত

উৎকণ্ঠা ছাড়া অন্য কোনভাবে আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ঐ সব বিষয়ে বেশী খবর তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু স্বদেশে যখন আমি রাশিয়ার নির্দেশিত নীতির মুখোমুখি হলাম, তখন আমার মার্কসবাদে তা খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হল না। আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য হলাম।

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট

স্বাভাবিকভাবেই আমি ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের থেকে দূরে রইলাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানীদেব সঙ্গে যোগদান করি। কিন্তু আমার নিকট স্বাধীনতা বা স্বরাজ তখন জাতীয় মুক্তি অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী অর্থবহ। আমার ধ্যানে তখন স্বাধীন ভারত মানে সমাজতন্ত্রী ভারত এবং স্বরাজ মানে দরিদ্র ও দলিত মানুষেব রাজত্ব। সুবিদিত করাচী প্রস্তাব সত্বেও এ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মসূচী আমার নিকট অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ বোধ হয়। সুতরাং সমমনোভাবাপন্ন স্বাধীনতাযোদ্ধাদের নিয়ে আমরা কংগ্রেস সমাজবাদী দল গঠন করলাম। অধিকতর বৈপ্লবিক পন্থায় মূল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা এবং কংগ্রেসের সামাজিক নীতিকে সমাজতান্ত্রিক করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। মার্কসীয় পরিভাষায়, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি প্রচেষ্টার সংহতি। কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকাশসাধন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্র করে তোলার পেছনে কংগ্রেস সমাজবাদী দলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কংগ্রেস সমাজবাদীরা সর্বাধিক আপোষহীন ও নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

হিটলারের উত্থান ও জনপ্রিয় ফ্রন্ট

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় আন্দোলনে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। তখন ইউরোপে অনেক শোচনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। হিটলারের পুরা ক্ষমতা দখলের মধ্যে অবশেষে এটার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। শীঘ্রই হিটলারের পতন ঘটবে বলে স্টালিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর মত একটি অর্ধ-উন্মাদ মানুষ যে জার্মানীর জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন তা তিনি বিশ্বাস করেন নি। স্টালিনের ধারণা ছিল, হিটলারের ক্ষমতাচূর্ণ নুড়ির ওপর কম্যুনিষ্ট জার্মানী জন্ম নেবে। এ সব তো ঘটলই না, পরন্তু হিটলার তার ক্ষমতা সংহত করে সাম্যবাদী, সমাজবাদী আন্দোলন ও

বড় বড় শ্রমিক সংস্থাগুলি দমন করে ফেললেন। ক্রেমলিনের প্রভুরা হিটলারের বিশ্ববিজয়ের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাগুলির সাফল্য দেখে শেষ অবধি ভীত হন এবং আকস্মিকভাবে মতটা পুরোপুরিই পালটে ফেলেন।

স্টালিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি কবর খুঁড়ে বের করা এখন রেওয়াজ হয়েছে। ক্রুশ্চেভ কিছু কিছু বের করেছেন। জুকভ মনে হয় আরও গভীরে খুঁড়তে চান। এ কাজে আমার কোন আগ্রহ নেই। আগেও বলেছি, আবার বলি, এমন দিন আসবে যখন স্টালিন অনুসৃত নীতিই সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতিকর এবং অপরাধজনক ভ্রান্তি বলে পরিগণিত হবে। আর ঐ নীতির জন্যই হিটলারের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভবপর হয়েছিল। স্টালিনের প্ররোচনায় জার্মান কম্যুনিষ্টরা যদি গণতন্ত্রী সমাজবাদীদের এক নম্বর শত্রু এবং নাৎসীদের তার পরের স্তরের দুশমন বলে ঘোষণা না করতেন, তা হলে হিটলার কখনই জার্মানীর মনিব হয়ে বসতে সমর্থ হতেন না। সমাজতান্ত্রিক ঐক্য ও জনপ্রিয় ফ্রণ্টের নীতি নাৎসীদের জয়লাভের পর গৃহীত হয়। সুরু থেকে ঐ নীতি অনুসৃত হলে ইতিহাসই বদলে যেত; হিটলারীয় নৃশংসতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হত না, হলেও তীব্রতা হ্রাস পেত।

রুশ আনুগত্যপরায়ণতার প্রভাবে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মতটা হঠাৎ বদলে গেল। জয়প্রিয় ফ্রণ্টের-নীতির প্রতিধ্বনি ভারতবর্ষেও শ্রুত হল। বহু বছর ধরে তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েছেন, কলঙ্ক রটিয়েছেন, তৎসত্ত্বেও এই সময় হঠাৎ কংগ্রেসকে জাতীয় ফ্রণ্ট বলে স্বীকার করলেন এবং সমর্থন জানালেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মৈত্রী

তখনও আমার গাঁট-ছড়া মার্কসবাদে বাঁধা। এই নতুন নীতির ফলে আমি উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়ি, আনন্দে আমার মন ভরে যায়। আমি সমাজ-তান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দলের ঐক্য এবং সেই ঐক্যবদ্ধ পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় সমাজতন্ত্র দ্রুত প্রসারলাভ করবে এই স্বপ্নে বিভোর হলাম।

নেতৃস্থানীয় আমার কোন কোন সহকর্মী, যথা—রামমনোহর লোহিয়া, এম· আর· মাসানী, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন এবং অশোক মেহতা এই নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়ে বলেছিলেন, এর ফলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু

মার্কসবাদ তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। নরেন্দ্র দেওয়ের মত শ্রদ্ধাভাজন নেতার সমর্থনলাভ করে আমি আমার স্বপ্ন ও আকাঙ্খার পথে অগ্রসর হলাম। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতার ফলে তাঁরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য হবার অধিকার পেলেন। কংগ্রেস-এর বিশ্বস্ত সমাজতন্ত্রী কর্মীদের হটিয়ে দলের শাখাগুলি (বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের) স্বেচ্ছায় ওদের হাতে তুলে দেওয়া হল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সমর্থনে কম্যুনিষ্টরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য কংগ্রেস সংগঠনেও নির্বাচিত হলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যুক্তভাবে কাজ করা হবে বলে চুক্তি হল।

মোহভঙ্গ

ঐ নীতির সর্বনাশা পরিণতি আজ বহুবিদিত। এ সবের অন্যতম একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা হলো : দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস সমাজবাদী দল হটে এলেন, প্রাধান্য পেলেন কম্যুনিষ্টরা। কিন্তু সেই ভয়াবহ দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্যেও একটি মহৎ কল্যাণের উদয় হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করি। অনেকেই আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে অনুভব করি যে, কোন সরকারী কম্যুনিষ্ট দলের (অর্থাৎ ক্রেমলিনের অনুমোদিত বা কমিনটার্ণভুক্ত) সঙ্গে কোনপ্রকার ঐক্য সম্ভবপর নয়। তাদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই , তারা মস্কোর হাতের পুতুল মাত্র। তাদের সদস্যদেব প্রথম ও প্রাথমিক আনুগত্য রাশিয়ার প্রতি, তারপর অন্যের কথা। কম্যুনিষ্ট পার্টির যুক্তফ্রণ্ট প্রস্তাব মানেই ছলনা, বডজোর সমকালীন ঘটনার চাপে গৃহীত সাময়িক নীতি। তাদের অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য হল, একদলীয় কম্যুনিষ্ট শাসন। সুবিধাজনক লেজুড়দের সঙ্গে কাজচালানো গোছের অস্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া কম্যুনিষ্টরা কারো সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা কল্পনাও করতে পারেন না। এই সব শিক্ষা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, কিন্তু তার জন্য বড বেশী দাম দিতে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ এখন নবজন্মের বেদনায় কাতর। জাতক মৃত হবে কি না সে কথা বলবার সময় এখনো আসে নি। আমার মত মানুষেরা সর্বান্তঃকরণে এর সুখপ্রদ পরিণতি কামনা করে। কম্যুনিষ্ট দল সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও খাস সোভিয়েত দেশে ঐ সময়ে আরও যে সব ঘটনা ঘটছিল তাও আমার চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

সেগুলি হলো : সুখ্যাত সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট নেতাদের ঘৃণ্য বিচার। তাঁদের লেখা আমি একদা সাগ্রহে এবং গো-গ্রাসে গিলেছিলাম। তারা আমার নিকট মহান বিপ্লবী বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। লেনিনের ঘনিষ্ট সহকর্মী-রূপে তাঁরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড বিস্ময় সাধন করেন।

কালক্রমে রাশিয়ার উপর জবরদস্তি করে যে সব অসাম্য চাপিযে দেওযা হযেছে সে সব সংবাদের সঙ্গে এই বিচারের কাহিনী, আমি যাঁদের সৎ বলে জানি এমন সব মানুষের নিকট থেকে পেতে থাকি। সর্বপ্রথম যে সব লেখক আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করে তার অন্যতম হল ইউজেনি লাযনসের Asignment in Utopia, আমার মতে সাহিত্য কর্মরূপেও তা অনবদ্য। অন্যান্য বিবরণ পরে আসে। জন ডিউযের ট্রট্স্কির ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। কামেনেভ, জিনোভিযেভ, রাডেক, রীকভ, বুখারিনের মত মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাঁদেব তথাকথিত স্বীকারোক্তির ঘটনা চূড়ান্তরূপে ভযকারজনক ছিল। কম্যুনিষ্ট মহাকাশের অনেক ক্ষুদ্রতর জ্যোতিষ্কের অদৃষ্টেও এই বকম ভযঙ্কর পরিণতি ঘটে। ক্রুশ্চেভ শেষের দিকে কযেকটি বিচারেব প্রকাশ্যে নিন্দা কবেছেন। এই সব বিচাবে তাঁব কোন হাত ছিল না। আমি নিঃসন্দেহ যে, সোভিযেত রাশিযাব স্বাধীনতাব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট নেতারাও অনেক নৃশংস অত্যাচাবেব ঘটনা উদ্ঘাটন কববেন। এমন দিন আসবে, যেদিন ট্রট্স্কী পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেন।

মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন

এই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা মার্কসবাদের স্বতঃসিদ্ধ বুনিযাদ সম্পর্কে পুনর্বিচাব কবতে বাধ্য করে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আমার অধিকাংশ সহকর্মী পুনর্বিবেচনার সেই বেদনাজনক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী শাখা এবং পরে (পুরাতন) সমাজতন্ত্রী দলের সামগ্রিক বিকাশধারা আদর্শের এই পুনর্বিচারের দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল একটি মার্কস-লেনিন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। গোড়ার দিকে আমাদের দাবী ছিল : ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ক্রেমলিন উভয়েই, বিশ্বের তৎকালীন পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপপ্রয়োগ করছেন। যে-ভাবেই প্রতিপাদন করা

হোক না কেন—সমাজ-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিরাপদ পথ নির্দেশক কি না, এ সম্পর্কে এখন আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বিপ্লবের ধাত্রী হিংসা—এই তত্ত্বে সর্বতোভাবে আপত্তি যদি নাও করা হয়, তথাপি আমার নিকট এটা স্পষ্ট :

(ক) যে সমাজে জনসাধারণের পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর, সেখানে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করলে প্রতি-বিপ্লবের কাজ করা হবে।

(খ) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র থাকতে পারে না বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যুক্তিযুক্ত অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে আমি শ্রমজীবী মানুষের একনায়কত্বের তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছি। ওটা বস্তুতঃপক্ষে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়ার একনায়ক শাসন।

জনতার বিপ্লবরূপেই রাশিয়ায় বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐ আন্দোলনে জার শাসিত রাশিয়ার বিপুল জন সমর্থন ছিল। কিন্তু লেনিন তাকে সংখ্যালঘু বিপ্লবে পরিণত করেন। বিদ্রোহী সৈন্য ও শহরের শ্রমজীবীদের সাহায্যে জোর করে তিনি গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। গণ-পরিষদে তিনি একান্তই সংখ্যালঘু ছিলেন। সংখ্যালঘু দল কর্তৃক জোর করে ক্ষমতা দখলের প্রত্যক্ষ ফল হল - উত্তরকালে বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং সমাজতন্ত্রের বিকৃতিসাধন। আমার মনে হয়, এমন কি যেখানে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নেই, সেখানেও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য জনসমর্থন থাকা চাই এবং বিপ্লবী সরকারের প্রতি জনগণের অধিকাংশের সমর্থন থাকা চাই। সাংবিধানিক নির্বাচন অপেক্ষা বিপ্লবের সময় জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যক্ত করা সহজ হয়। সামাজিক বিপ্লবকে গণতন্ত্রে বিকশিত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই দিতে হবে। জনসাধারণের সহজাত প্রেরণা সর্বদাই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষে রয়েছে। তাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় একনায়কী শাসন স্বীকার করা কখনই স্বাভাবিক নয়। লেনিনের অপূর্ব অনুপ্রেরণায় কম্যুনিষ্টরা বহুবিধ অন্যায় ও অসৎ উপায়ে জনসাধারণের ওপর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একনায়কী শাসন চাপিয়ে দিয়েছে। সম্ভবতঃ চীনই একমাত্র ব্যতিক্রম। সেখানে মনে হয়, চীয়াং কাই-শেক অপেক্ষা মাও সে-তুঙের পক্ষে অনেক বেশী লোক আছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, চীনা সরকার একনায়কী সরকার নয়। সম্ভবতঃ এটা হলো সংখ্যালঘুর ওপর

সংখ্যাগুরুর একনায়কত্ব। আবার যুগোশ্লাভিয়াতেও মনে হয় এই রকমই। অন্যত্র কম্যুনিষ্ট শাসন সংখ্যালঘুর শাসন। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যাই হোক, যেখানে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আছেন সেখানেই সুনিশ্চিতভাবে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের দু-মুখো ভাষ্যানুসারে একেই তাঁরা বলে থাকেন জনগণতন্ত্র, এমন কি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ঐসব ঘটনার দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, **কোন প্রকার একনায়কত্বের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছান যায় না।**

ধনবাদের অস্বীকৃতি মাত্রই যে সমাজতন্ত্র নয়—এটা আমার নিকট স্পষ্ট হল রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। ধনবাদ ধ্বংস করা, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, কৃষি প্রভৃতি সবকিছু জাতীয়করণ এবং যৌথ-মালিকানায় আনা সম্ভব হলেও সমাজতন্ত্র বহুদূরে থাকতে পারে। না, কেবল দূরেই থাকা নয়, বিপরীতমুখীও হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমরা যে কেবল বিধিবৎ স্বাধীনতা অস্বীকার দেখি তা নয়, সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বীকৃতি নেই, সমতাও নেই, সেখানে নতুন এক বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে, নতুনতর পদ্ধতিতে শোষণ চলছে। এ সব সমাজতন্ত্রের অভাব মাত্র নয়, এটা হলো সমাজতন্ত্রের অস্বীকৃতি।

রাশিয়ার সমাজতন্ত্র

রাশিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তার মূলে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নির্যাতন ছিল বলে ক্রুশ্চেভ আমাদের এখন বিশ্বাস করতে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, এটা তারই পরিণতি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রবাদ (Statism) স্পষ্টতঃই এই অশুভ ঘটনার মূলে রয়েছে। পেছনের দিকে তাকালে, এমন কি এও যথেষ্ট কৈফিয়ৎ বলে মনে হয় না। কারণ অতি কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রসর্বস্বতার মূলে কি ছিল সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই করা যেতে পারে। এর দুটো উত্তর হওয়া সম্ভব।

এক : মার্কস কল্পনা করেছিলেন, ইতিহাসের নিয়মে সর্বহারারাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করবেন। তারা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ শিল্পোন্নত বুর্জোয়া জাতির সর্বহারা সমাজের সর্বাধিক সংখ্যাগুরু অংশ হবেন। অপরদিকে, আধা সামরিক শৃঙ্খলায় গড়া দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রিত ও কৃতসংকল্প একদল বিপ্লবী নিয়ে

ক্ষমতা দখল করার পর লেনিন শিল্পে অনুন্নত একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। জন কাটস্কাই তাঁর From Marx to Mao শীর্ষক সুন্দর প্রবন্ধে (Soviet Survey, June-July 1957) যেমন বলেছেন—"মার্কসের বিশ্বাস ছিল প্রচলিত বাস্তব অবস্থা থেকেই সমাজতন্ত্রের উদয় হবে। অর্থনীতি প্রয়োজনীয় পূর্ণতা লাভ করলেই শ্রমিকশ্রেণী নিজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী-শক্তিতে পরিণত হবে। অন্যদিকে, বেবাফ্ থেকে বাকুনিন পর্যন্ত মার্কস পূর্ব সকল ধৈর্যহীন সমাজতন্ত্রীদের মত লেনিনের চিন্তার মূলে এই ধারণা ছিল যে, সমাজতন্ত্র অপরিহার্য, শর্তাধীন নয়, পরন্তু অন্তর্দৃষ্টি, ইচ্ছাশক্তি, ও সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দ্বারা লভ্য।

দুই : লেনিনের নির্দেশিত পথে স্টালিন অতিরিক্ত চাপের দ্বারা কষ্টকৃত উপায়ে একটি অনগ্রসর দেশের শিল্পায়ন করেন। ও-কাজের যা ধর্ম তাতে সামরিক জবরদস্তি এবং স্বাধীনতার অবদমন ছাড়া তা করা সম্ভবপর ছিল না। পল এ. বারান আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্ট্যানফোর্ড) অধ্যাপক। সেখানকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালযগুলির মধ্যে সম্ভবত: তিনিই একমাত্র মার্কসবাদী শিক্ষক। তিনি লিখেছেন : (The Political Economy of Growth ; N. Y. 1957) : "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং তার পরে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ ভুল-ভ্রান্তি পাপের দায় স্টালিন, বেরিয়া এবং তাদের সহগামীদের ওপর দেওয়ার একমাত্র অর্থ—ব্যক্তিবাদের উল্টো পিঠের প্রতি আস্থা স্থাপন করা। কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এই সাধারণ ধারণাটি পুরোপুরি বোধগম্য যে, নেতৃত্বের দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছিল তার জন্য সমগ্র ব্যবস্থাটাই দায়ী। তথাপি গোটা সমাজতন্ত্রই বরবাদ করে দেওয়া প্রয়োজন এমন কোন সিদ্ধান্ত এর থেকে করলে তা শোচনীয়ভাবে প্রতারণামূলকই হবে। স্টালিন ও তার 'জো-হুকুম' লোকজন কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুষ্কার্যের জন্য সমাজতন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দায়ী করা যায় না।"

বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ে ভীত ও আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার দ্বারা ক্লিষ্ট একটি অনগ্রসর দেশকে দ্রুতগতিতে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রকরণের মধ্যেই এই বিপদ নিহিত রয়েছে। রাশিয়ায় প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, যা পরে প্রতিটি কম্যুনিষ্ট দেশে অনুসৃত হয়েছে, তা এই দুটি সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বোধগম্য হয়।

ভারতবর্ষের শিক্ষা

ভারতের জন্য তো বটেই, বস্তুতঃ শিল্পে অনগ্রসর এশীয় দেশগুলির পক্ষে এটি এক মহৎ শিক্ষা। এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ হতে ব্যগ্র। ঐ গতি অত্যধিক দ্রুততর করলে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এশিয়াকে তার নিজস্ব শিল্পায়নের আদর্শ এবং সমাজতন্ত্রে পৌছবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচের মধ্যে থেকে শিল্পায়ন করলে তার গতির কোন পরিবর্তন বা প্রভেদ ঘটাতে পারবে না, এমন চিন্তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। চলার এই বেগ একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে নিজেই অবশ্যম্ভাবীরূপে একনায়কত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আমি যখন এ-সবের কিছু কিছু উপলব্ধি করতে শুরু করি, তখন থেকেই আমার মন বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রশক্তির হ্রাস এবং পরিপূরক যৌথ আচরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিকাশ বিষয়ে আমার আগ্রহ আসে।

পথ ও লক্ষ্য

মার্কসীয় নীতি বলে, যে উপায়ে বিপ্লব ঘটানো যায় সেটাই সৎ উপায়। তাই কাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ বা মার্কসীয় দর্শন হল একটি নীতিবর্জিত দর্শন। নীতিহীনতার জন্য মার্কসীয় পন্থা সর্বতোভাবে নিন্দিত হলেও ওটা একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সকল মতের রাজনীতিবিদগণই স্মরণাতীত-কাল থেকে নীতিহীনতা অনুসরণ করে আসছেন। অবশ্য কথাবার্তায় তাঁরা এর নিন্দা করে থাকেন। কিন্তু তার জন্য কাজের কিছু হের-ফের হয় না। এখনো সর্বত্র ফলাফলের নিরিখে উপায়ের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাকেই বুনিয়াদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়। কিন্তু যখন মহাত্মা গান্ধীর মত মহৎ হৃদয় মানুষ রাজনীতির আঙ্গিনায় আসেন, কেবল তখনই মাত্র রাজনীতিকে নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত করার এক আন্তরিক প্রয়াস সুরু হয়।

মন্দ পথ গ্রহণের ফলে রাশিয়ায় মন্দ পরিণতি হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিকট যারা অবাঞ্ছিত তাদের অপসারণ করতে নোংরা পন্থায় সাংঘাতিক সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল ঘটনা আমাকে মার্কসীয় বিপ্লব-নীতি-বিজ্ঞানের বিরোধী করে তোলে এবং মন্দ উপায়ের দ্বারা ভাল ফল কখনো

পাওয়া যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। এটা সুস্পষ্ট যে এই সব প্রশ্ন বার বার ভেবে দেখার ফলে আমি ধীরে ধীরে গান্ধীজীর নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। কিন্তু তখনো আমার পূর্ণ পরিবর্তন হয়নি, তাই আমি গণতান্ত্রিক-সমাজবাদের মধ্যপথে অবস্থান করছিলাম।

মার্কসবাদে আমার অধিকতর উদ্দীপনাময় দিনগুলিতে প্রকৃতিগতভাবে আমি সামাজিক গণতন্ত্র, ব্রিটিশ ফেবিয়ানমতবাদ এবং প্রায়োগিক সমাজতন্ত্রের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছি। ব্যর্থতার ধাক্কায় পিছিয়ে গিয়ে সংস্কার ও শোধনবাদের গর্তে যাতে আটকে না পড়ি, সে জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার মনে হত, আমি যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবি তা হবে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র। সমাজকে তা একেবারে ভিত থেকে বদলে দেবে, কিন্তু স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান মানবীয় গুণগুলিও সুরক্ষিত রাখবে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে এই নতুন সমাজতন্ত্রকে বাস্তবরূপ দেওয়া সহজ কাজ ছিল না। এখনো সে কাজ অনেক দূরে।

প্রতীচ্যের সমাজতন্ত্র

ইউরোপের কাছ থেকে এশিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাবার (এই প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি) পর থেকে ঐ দেশের সমাজতন্ত্রীবা আমাদের নিকট আসছেন এবং সবরকমের পরামর্শ দিচ্ছেন। এই পরামর্শ ও বন্ধুত্ব সাদরে বরণীয়। কিন্তু একটি ছোট্ট ব্যাপার আছে—সেটা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীরা যেন কখনই ভুলে না যান। যদি ইউরোপীয় সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়ে থাকে, ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রও কোন বিশিষ্ট সাফল্য লাভ করেনি। জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের গৌরব বলে চিহ্নিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের কয়েকজন মহান মানুষ—এঙ্গেল স্বয়ং, বেবেল, কাট্স্কাই, বড় লেবনেচ্ট (যাঁকে মার্কস ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি উৎসর্গ করেন) এবং আরো অনেকে এই আদর্শকে মহিমান্বিত করে তোলেন। তৎসত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, তখন জার্মানীর সামাজিক গণতন্ত্র নৈরাশ্যজনকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ফরাসী সমাজতন্ত্রের ইতিহাস ছিল সব চেয়ে হতাশাব্যঞ্জক। সবচেয়ে লজ্জারজনক ঘটনা হল, মিশর আক্রমণে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকারের সঙ্গে গাই মোলেট সরকারের আঁতাত। ব্রিটেনের শ্রমিক দল, বিশেষ করে এটলির প্রথম সরকার স্বদেশে

এবং বিদেশে সন্দেহাতীতভাবে তাঁদের কাজের একটি সুন্দর রেকর্ড রেখে গেছেন। মিশরের ঘটনার সময় গেইটস্কেলের নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রকে মর্যাদাদান করেছে। ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রীদের ভাণ্ডারে এখনো আরো অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তবু গ্রেট ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক-গণতন্ত্র থেকে এখনো অনেক দূরে। সমাজতন্ত্রের ক্ষীণ বিকল্প হলো জনকল্যাণ রাষ্ট্র। ওটাও সর্বদা রক্ষণশীল দলের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে আছে। জনকল্যাণ রাষ্ট্র ম্যাকমিলানের সুবিধাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

স্ক্যান্‌ডেনেভিয়ায়, বিশেষতঃ সুইডেনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অনেকখানি সফল হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু সেখানেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয় নি। সুইডিশ জাতির ক্ষুদ্র আকার এবং সমবায়ের ন্যায় অ-রাষ্ট্রীয় ধরণের (বা রাষ্ট্রশক্তির বাইরের) সমাজতন্ত্রের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সুইডেনে সমাজতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সাফল্যলাভ করেছে। মার্কসীয় ও অ-মার্কসীয় উভয় প্রকার ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রই শিল্পায়িত সমাজের প্রতিকৃতি। মার্কস এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়কদের মতে, সমাজে ধনবাদের পূর্ণতা লাভ করার পরই সমাজতন্ত্রের উদয় হয়। এশিয়া খণ্ডে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ শৈশবাবস্থায় রয়েছে। এশীয় দেশগুলি মুখ্যতঃ গ্রামীণ এবং কৃষি ও কৃষক প্রধান। এই রকম পরিবেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজকর্মের সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক-দের পরিচয় নেই। সুতরাং তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে খুব সামান্য পথনির্দেশই পাওয়া যেতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিষ্টরা রাশিয়া এবং চীনের অনগ্রসর ও গ্রামীণ এলাকায় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন। আমার কাছে সমাজতন্ত্রের সারবস্তু হল—সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন মানুষের বিকাশ ও সৌভ্রাতৃত্ব। কিন্তু যে সমাজতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীরা রচনা করেছেন তা এই আদর্শের অনেক পিছনে পড়ে আছে।

এশীয় সমাজতন্ত্রের নকশা

এশীয় সমাজতন্ত্রীদের নিজস্ব কলা-কৌশলের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পাশ্চাত্যের সমাজবাদ বা রাশিয়ার সাম্যবাদ থেকে আমাদের কিছু শিখবার নেই, এরকম ইঙ্গিত এ কথার মধ্যে রয়েছে এমন যেন কেউ অনুমান না করেন। কিন্তু মূল ভাবনা-চিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নব

পন্থার প্রবর্তন প্রভৃতি মুখ্য কাজগুলি আমাদেরই করতে হবে। আমি আশঙ্কা করি, ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলনে মৌলিক চিন্তার এই ধারাটি গত কয়েক বৎসর যাবৎ রুদ্ধ হয়ে আছে। অনুসন্ধানের সূত্রটি পুনরায় বিকাশের এই হচ্ছে সময়।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল এবং পুরাতন সোসালিষ্ট পার্টিতে যারা কাজ করেছেন, তাদের সকলের সমবেত অভিজ্ঞতার কথাই আমি এই পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়নের প্রণালীর মধ্যে সংক্ষেপে বলেছি। ওখানে যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি তাও যৌথধর্মী। গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ, বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতি-সম্মত উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি হল যৌথ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত। এইভাবে মার্কস লেনিনবাদী কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক প্রজা সোসালিষ্ট দলের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দুই : সমাজতন্ত্র কেন চাই

[গত ত্রিশের দশকে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণ দলের এই ম্যানিফেস্টো রচনা করেন। ভারতীয় পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মপন্থা এতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং দলিলটি দলের নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সামাজিক পুনর্গঠনের পন্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও প্রয়োজনীয়। জমিদারীপ্রথা ও পুঁজিবাদ, দুটিই বিদেশী ব্যবস্থা এবং ভারতে রাজত্ব করার সময় বিদেশী সরকার এই দুটি চালু করে। পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত সম্পদের কেন্দ্রীকরণ থেকেই এই দুটির উদ্ভব এবং এটি আমাদের দেশের মূল সমস্যা।]

সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক কথাই হল, এটি সমাজ পুনর্গঠনের একটি পথ। এটি ব্যক্তিগত চারিত্রিক নীতি নয়, বা এমন একটা কিছু নয় যা আমি ও আপনি কার্যকরী করতে পারি। সাত-তাড়াতাড়ি উন্নতি করার যাদুদণ্ডও এটি নয়। আমরা যখন ভারতে সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বলি, তখন এর তাৎপর্য হল, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করা, দেশের কৃষিখামার-কারখানা-স্কুল-থিয়েটার সর্বত্র এর প্রয়োগ করা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে একটি গ্রাম কিংবা একটি কারখানা সমাজতান্ত্রিক পথে পরিচালনা করা যায়। এটি প্রকৃত সমাজতন্ত্র নয়। ল্যাবরেটরীর দেওয়ালে প্রিজমের সাহায্যে সাতটি রংয়ের খেলা দেখানো যেতে পারে, কিন্তু এটি নিশ্চয় আকাশের রামধনু নয়!

অতএব, যারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চান, তাদের পেছনে শক্তি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা চাই। তাত্ত্বিকদের কোন দলই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেন না যদি তাদের হাতে ক্ষমতা না থাকে। এই ক্ষমতার অর্থ কি? সাম্প্রতিক বিশ্বের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রই হল সেই হাতিয়ার, যার সাহায্যে কোন দল বা ব্যক্তি সমাজের ওপর তার পরিকল্পনা, কর্মপন্থা ইত্যাদি চাপিয়ে দিতে পারে। যদি আপনার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে তবেই আপনি আইন প্রণয়ন করতে পারেন, প্রচার ও শিক্ষার বাহন-

গুলিকে ব্যবহার করতে পারেন, আপনি আপনার ইচ্ছাকে রূপ দিতে পারেন। এবং এতে যদি কোনও বাধা দেখা দেয়, তবে আপনি রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগাতে পারেন।

বর্তমান পৃথিবীতে কোনও দলই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেনা। দলটি নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা সামরিক তৎপরতার ফলে ক্ষমতায় আসছে, সে-প্রসঙ্গ এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

এর পাশাপাশি আমরা অন্য একটি পথের কথাও চিন্তা করতে পারি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন একটি দল সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে যদি দুটি বিষয়ে সে মন দেয়—হয় এ-পথের বাধা-বিপত্তিগুলিকে জয় করার মতো যথেষ্ট দমনমূলক শক্তি তার আছে, অথবা বিরোধীদের মোকাবিলা করার মতো জনসমর্থন তার পেছনে রয়েছে। দুইয়েরই লক্ষ্য এক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি জনসাধারণের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবেই, এবং ধনিক শ্রেণীকে বিরোধী দলে ঠেলে দিতে হবে।

আমি বলেছি যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন দল চাইলে এই পৃথিবীতেই সমাজতান্ত্রিক স্বর্গ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এ-কাজ শুরু করতে হলে কি চাই? সেই দলটি কি সমস্ত শোষক ও পেটমোটা পুঁজিবাদীদের ঘিরে ফেলে গুলি করে মারবে? ধরা যাক, পণ্ডিত জহরলাল সমাজতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হলেন। তিনি কি তবে উত্তরপ্রদেশের তালুকদারদের লাইনে দাঁড় করিয়ে মেরে ফেলবেন? রাজা ও মহাজনদের ধনসম্পত্তি অধিকার করে তিনি কি জনগণের মধ্যে তা সমানভাবে বিলিয়ে দেবেন? তিনি কি টাটা আয়রন ওয়ার্কসের দায়িত্ব কর্মরত শ্রমিকদের ওপর দেবেন যাতে তারা ইচ্ছেমতো ভাল-মন্দ যেভাবেই হোক কারখানাটি চালাবে? তিনি কি দেশের সব জমি নিয়ে একটু একটু করে সব ভারতীয়দের মধ্যে ভাগ করে দেবেন? এটা করাই কি সমাজতান্ত্রিক কাজ হবে?

না, সমাজতন্ত্র এসবের চেয়ে আরও বেশি গভীর তাৎপর্যমূলক, বৈজ্ঞানিক, আরও বেশি উন্নত পথ।

তাহলে পণ্ডিত জহরলালকে কি করতে হবে?

আমরা যে সমাজে বাস করছি এবং বহির্ভারতের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাব।

মৌলিক সমস্যা অসাম্য

প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে তা হল, অদ্ভুত ও বেদনাজনক অসাম্য ব্যবস্থা—পদমর্যাদা, সংস্কৃতি, সুযোগ-সুবিধায় অসাম্য, জীবনের সুন্দর জিনিসগুলির অসম বণ্টন ব্যবস্থা। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, আবর্জনা, রোগ, অশিক্ষা— এই-ই জুটছে গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের ভাগ্যে। আর কিছু লোকের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, সংস্কৃতি, পদমর্যাদা ও ক্ষমতা। যেমন আমাদের দেশে তেমনি অন্যত্রও, যদিও এ-দেশেই এটি বেশি। এই অসুখী ভারত ছাড়া আর কোথায়ও সম্পদ ও দারিদ্র্যে এবং উন্নত ও অবনত অবস্থার এমন পাশাপাশি সহাবস্থান আছে কী ?

এই অসাম্য এবং এর সামাজিক পরিণামগুলিই আমাদের সমাজের কেন্দ্রীয় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতেই বিভিন্ন যুগের মনীষীরা তাদের সর্বশক্তি নিযোগ করেছেন, কিন্তু এ-যুগেই এই চেষ্টা সর্বাধিক পরিমানে হচ্ছে। দান, সেবাকাজ, তত্ত্ব, দুর্ভাগ্যশালীদের প্রতি দয়ালু হবার জন্য সৌভাগ্যবানদের কাছে আবেদন, ঐশ্বর্যের প্রতি ধিক্কার, দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি, প্রযোজন কমিয়ে আনা ইত্যাদি হল অসাম্য দূর করার কয়েকটি প্রয়াস।

একজন সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এ-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সমস্যার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যেতে পারে রোগের প্রতি ডাক্তারের দৃষ্টিভঙ্গী। সে কখনও অসাম্যকে চিরস্থায়ী বলে মেনে নেয়না এবং এটিকে নির্মূল করতে এগিয়ে যায়। সে সমস্যাটির মূলে গিয়ে অসাম্যবৃদ্ধির কারণটিকে ধরতে চায়।

জৈবিক অসাম্য

অসাম্যের সন্ধান করতে গিয়ে একজন সমাজতান্ত্রিক প্রথমেই শরীরতত্ত্ব-বিদের মুখোমুখি হয়। সাধারণতঃ এটা বলা হয় যে সবাই সমান শক্তি নিয়ে জন্মায় না। এবং ডেমোক্র্যাটরাও এই কথা পুনরুচ্চারণ করে। বলা হয়, আমরা জন্ম থেকেই আভ্যন্তরীন শক্তির ব্যাপারে অসম, গুণগত ও সংখ্যাগত-ভাবে। এটাকে অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। একজন বাস্তববাদীও শরীরতত্ত্ববিদের এই উক্তি সমর্থন করবে।

কিন্তু দেখা যাক শরীরতত্ত্ববিদের কথিত এই অসাম্যটি সমাজতান্ত্রিকের

সামাজিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলে। এটা ঠিক যে সম্ভাবনা-তরঙ্গের ঘণ্টাকৃতি গ্রাফ্ মানবীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজের এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় প্রতিভাশালী, অন্য প্রান্তে রয়েছে স্বল্পসংখ্যক নির্বোধেরা এবং মাঝখানে গরিষ্ঠসংখ্যক মাঝারি মেধার মানুষ।

এই জৈবিক অসাম্য নানা সামাজিক আকারে আছে। যেমন, বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষায় ও কৃতিত্ব অর্জনে অসাম্য। আর রয়েছে সম্পদে, পদমর্যাদায়, সুযোগে অসাম্য। রবীন্দ্রনাথ ও রমন সমাজে আছেন, এর বিরুদ্ধে সমাজ-তন্ত্রীদের বিদ্রোহ নয়। সে এর জন্য খুশী যে এ ধরণের প্রতিভা রয়েছে এদেশে। তার দুঃখ এই যে সুযোগ ও বিকাশের অভাবে বহু সম্ভাবনাময় প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে। সোস্যালিষ্টরা বা অন্য কেউই মনে করেন না যে অসাম্যের অশুভ পরিণামেই কিছু প্রতিভাশালী ব্যক্তি মহান বিজ্ঞানী ও কবি হয়ে ওঠেন। তাদের যুক্তি হল, পদমর্যাদা ও সম্পদে অসাম্যের দরুণই সমাজে যত অন্যায় সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত, তবে সম্পত্তির বণ্টনে অসাম্যই সামাজিক সমস্যার মূলে।

সম্পদে অসাম্য জৈবিক অসাম্যজনিত নয়

সম্পদে অসাম্য আসছে কোত্থেকে? এই যুক্তি আসতে পারে যে, এটাও জৈবিক অসাম্য হতেই সৃষ্ট। চতুররা ভাল ব্যবসায়ী হন এবং সেজন্য ধনীও হন। ক্ষণিকের জন্য এই যুক্তি মানলেও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য কী? এক্ষেত্রে জৈবিক অসাম্যজনিত যুক্তি আসতেই পারে না। লক্ষপতির মূর্খ পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে যা সম্পত্তি পাবেন, প্রতিভাবান হলেও তাই পাবেন। কাজেই উত্তর পুরুষের প্রাপ্তি হয় কিছু সামাজিক নিয়মরীতির জন্য। এই নিয়ম পাল্টালেই আজকের লক্ষপতি গরিবে পরিণত হবেন।

তবে নিজেরা ভাগ্য করে তুলেছেন এমন লোকের কথা বিচার্য, তারা স্বকীয় যোগ্যতাবলেই তা করেনি কী? সফল ব্যবসায়ী হতে হলে বিশেষ ধরণের যোগ্যতা থাকা চাই বটে। কিন্তু এটা কী ভগবদদত্ত নিয়ম বলে মেনে নেব যে কিছু বিশেষ ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সম্পদ আহরণ করবে এবং অন্যেরা শুধু তাদেরই ইচ্ছা হলে সম্পদ আহরণ করতে পারবেন?

একজন বিখ্যাত গণিততত্ত্ববিদ প্রতিভাশালী হতে পারেন, তার গবেষণা-

লব্ধ ফলাফল তাকে অমরত্ব এনে দিলেও তা তাকে ধনী করেনা। তার প্রতিভা কি একজন ব্যবসায়ীর চেয়ে কম যিনি ব্যবসার কতগুলি নিয়ম-কানুন মেনে অর্থ উপার্জন করেন? একজন বৈজ্ঞানিক যতই বুদ্ধিমান হোন নিজের গবেষণাগারের থেকে টাকা করবেন না, ব্যবসায়ীতে পরিণত হলে অবশ্য তা হতে পারে। ব্যবসায়ীর গবেষণারই কেবল সম্পদ অর্জন করে।

উৎপাদন ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ

এই জগতের একদিকে রয়েছে মানুষ, অন্যদিকে প্রকৃতি। প্রকৃতির গর্ভেই সব সম্পদ। মানুষ প্রকৃতির ওপর কাজ করে তার যা প্রয়োজন সংগ্রহ করে। মানুষের এই কাজই তার সম্পদ সৃষ্টি করে। এইভাবে সম্পদের উৎস প্রকৃতি এবং মানুষের শ্রম এই সম্পদ তৈরী করে। এটাই সব অর্থনীতির মৌল ভিত্তি।

সম্পদ জমে কিভাবে? এটা সত্যি যে মানুষের যা প্রয়োজন তা-ই যদি সে প্রকৃতি থেকে উৎপাদন করে তবে সম্পদ জমতে পারে না। প্রকৃতি থেকে মানুষ কতখানি সম্পদ তৈরী করবে সেটা নির্ভর করে মানুষের উৎপাদিকা শক্তির ওপর, অর্থাৎ মানুষের যন্ত্রপাতি ও কর্মপদ্ধতির ওপর। তাই অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের জন্য যা দরকার তা হল, মানুষের উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়ন যা তার প্রয়োজনের থেকে বেশি সম্পদ আহরণ করতে পারে। এটাই হল অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের মূল শর্ত। শিকার করা, মাছ ধরা, চাষবাসের পদ্ধতি উন্নত হয়ে যখন এমন স্তরে এসে গেল যে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার চেয়েও বেশি উৎপাদন হতে লাগল, তখনই অতিরিক্ত সম্পদের আহরণ সুরু হয়ে গেল।

একটি সমাজে উৎপাদিকা শক্তি যখন এমন স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়, তখন ঐ সমাজের প্রতিটি মানুষই কিছুটা পরিমাণে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে; অবশ্য এজন্য প্রতিটি মানুষেরই নিজের জন্য কাজ করার সুযোগ থাকা দরকার, নিজের যন্ত্রপাতি থাকা দরকার, প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণের স্বাধীনতা দরকার এবং নিজের উৎপাদিত বস্তুর ওপর অধিকার থাকা প্রয়োজন। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত উৎপাদন এবং সর্বনিম্ন ব্যক্তিগত ভোগের ওপরই নির্ভর করে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের হার। এমনও তো হতে পারে

যে কোন কোন মানুষ যা উৎপাদন করে তার সবই ভোগ করে ফেলে। এটি হলে সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব নয়। এরা অবশ্যই উপোষ করে না, কারণ আমরা আগেই দেখেছি এই স্তরে উৎপাদিকা শক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তৈরী করছে।

সমাজে কিছু লোক দক্ষ থাকতে পারে, তারা অন্যদের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে কিছু সঞ্চয় করতে পারে। কম দক্ষ লোকেরা তা পারে না। কিন্তু সর্বত্রই মানুষের কাজ থাকলে, কাজের যন্ত্রপাতি ও সব জিনিষের সুযোগ থাকলে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সমাজের কথায় আসা যাক। কৃষি বা শিল্প, সর্বত্রই উৎপাদনের পদ্ধতি এত উন্নত যে সবাই তার নিজের চাহিদার চেয়ে বেশিই উৎপাদন করতে সক্ষম। সাবেক পদ্ধতিতেও ভারতীয় কৃষকরা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে। তবু কোটি কোটি কৃষক অনাহারে আছে। অন্যদিকে কিছু লোক সব চাহিদা মিটিযে নানা বিলাসব্যসন ভোগ করছে। একদিকে এই নিদারুণ অভাব, অন্যদিকে বিলাসী জীবন, এ অবস্থার সৃষ্টি কীভাবে হল?

গরীবদের ব্যাপার দেখা যাক। বর্তমান উন্নত পদ্ধতিতে তাদের এ অবস্থা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে, তাদের কাজের স্বাধীনতা নেই, এমন কি প্রকৃতিও তাদের কাছে মুক্ত নয। যন্ত্রপাতি তাদের হাতে নেই। দেশের লোকের এই গরীবীর মূল কারণ, উৎপাদন সামগ্রী, জমি, যন্ত্রপাতি তাদের হাতে নেই। সবকিছুর জন্যই তাদের টাকা দিতে হয়, এবং যত বেশি টাকা দেবে উৎপাদনের অংশের তত কম তারা পাবে। বেশির ভাগ গরীবেরই নিজের শ্রমটুকু বেচা ছাড়া কিছুই নেই। উৎপাদন সামগ্রী সবার কাছে প্রাপ্য হলে দেশে গরীবী থাকত না। অবশ্য এখন দেশের জনসংখ্যা এমন স্তরে পৌঁচেছে যে উৎপাদন সামগ্রীর বর্তমান উৎপাদনশীলতায়ও সবার পক্ষে যথেষ্ট সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তবে ভারতের সেই অবস্থা নয়।

এখন ধনীদের কথায় আসা যাক। কিছু লোক গরীবদের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি সম্পদ অর্জন করল কীভাবে? কোনো ব্যক্তি, সে যত দক্ষই হোক না কেন, একই উৎপাদন সামগ্রীর সাহায্যে অন্যের চেয়ে হাজার গুণ বেশি উৎপাদন করতে পারে না। বিরাট ধনীরা নিজেদের শ্রমে ধনী হয় না। আগেই বলেছি, প্রকৃতির থেকে উৎপাদন করা ছাড়া সম্পদ অর্জনের অন্য সূত্র নেই, এবং সম্পদ সঞ্চয়ের একমাত্র পথ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি

উৎপাদন করা। সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির যে উন্নতি হয়েছে সেই অনুযায়ীই উৎপাদনশীলতা বাড়ে। পশ্চিমের উন্নত জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায়ও একই ব্যাপার। সেখানে, বর্তমানে এখানেও দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন পদ্ধতি, বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার এমন উন্নতি হয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তিই একক স্বাধীনভাবে উৎপাদন করতে সমর্থ নয়। কিন্তু তবু এতে আমাব যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয না। সব ব্যক্তিই যদি স্বকীয় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ভাগ নেয়, তবে আমার কল্পিত সমাজের মতোই অবস্থা থাকবে। সমাজেব সবাই কিছু সম্পদ সঞ্চয় করবে এবং কোনো গরীবী থাকবে না বা সম্পদ কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে না

তাহলে, বর্তমান সমাজের এই অবস্থা কেন? যুক্তি দেওয়া যায়, কিছু সাবধানী ব্যক্তির সঞ্চয়ের ফলেই এই অবস্থা। এর উত্তর হচ্ছে, মিতব্যয় ও শিল্পপ্রবণতা একই পরিবারে কযেক প্রজন্ম ধরে থাকে না, এর জন্যই সম্পদ বেড়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল। সম্পদের উৎস কিছু ব্যক্তিব দক্ষতা বা বংশগত গুণাবলী-জনিত নয়।

সম্পদ ও শোষণ

সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্ব এই রহস্য উৎঘাটন করবে। কোনো সমাজ উৎপাদনশীলতায জীবনধারণের স্তর থেকে একটু উন্নত হলে স্বভাবতই কেউ কেউ তাব কাজের জন্য অন্য দশজনকে নিযোগ করতে পারে এবং পরিবর্তে তাদেব বেঁচে থাকার প্রযোজনটুকুব জন্য বেতন দিয়ে বাড়তিটা নিজের জন্য রাখতে পারে। সেই ব্যক্তি তার নিয়োজিত কর্মীদের চেয়ে দশগুণ বেশী সম্পদ জমাতে পারে, শীঘ্রই সে ধনী হয়ে উঠবে। এটা পরিষ্কার, সে যত বেশি লোক নিযুক্ত করবে তত বেশি সম্পদ বাড়াবে। আবার ধরা যাক, সেই সমাজে কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির জমির ওপর একাধিপত্য স্থাপন করল। সেই একাধিপত্যের সুবাদে সে কাউকে জমিতে চাষ করতে দেবে না, যতক্ষণ না জমির উৎপাদনের একাংশ তাকে দেওয়া হয়। সেও দিনে দিনে ধনী হয়ে উঠবে, যত বেশি জমি তার দখলে থাকবে সে তত ধনী হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এইভাবেই সম্পত্তি ও সম্পদের বিবর্তন। সম্পদে অসাম্য এবং শোষণের প্রকৃত উৎস এইখানেই।

প্রশ্ন হতে পারে, ব্যক্তি অন্যের হয়ে কাজ করে নিজের উৎপাদনের ভাগ

দিয়ে এভাবে বোকা বনতে যাবে কেন? সে ত নিজে কাজ করে সবটাই নিজে নিতে পারে। মানব সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর উত্তর মিলবে। সব সমাজেই যতদিন জঙ্গল সাফ করে নিজের জমি চাষ করার মুক্ত ব্যবস্থা ছিল ততদিন কেউই অন্যের হয়ে কাজ করে নি, অবশ্য নিজেদের পারস্পরিক সুবিধায় কাজ করা ছাড়া। প্রকৃতির দমনেই কেউ কেউ একাধিপত্য লাভ করে। আদি যুগে শক্তিবলে এই একাধিপত্য অর্জন করা হত। সর্বত্রই কিছু লোক প্রকৃতি, বিশেষ করে জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে অন্যদের ক্রীতদাস, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বা ভাড়া করা শ্রমিকে পর্যবসিত করল। শিল্পেও যতদিন ব্যক্তিগত একক প্রয়াসে উৎপাদন সম্ভব ছিল ততদিন শিল্প আয়ে ব্যবধান ও শোষণ কম ছিল। কিন্তু শিল্প উন্নত হওয়ায় এবং শহরের উদ্ভবের সাথে সাথে দাস বা দক্ষ কারিগররাও মালিকের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হল, ফলে শিল্প আয়েও বৈষম্য এল। এই ধারা শিল্প বিপ্লবের পর প্রবল হয়, আরো বেশি শ্রমিক মালিকাধীন হয়, শোষণ বাড়তে থাকে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে, সমাজে ত বহু মানুষ আছেন যারা অন্য কারোর শ্রম নিয়োগ করেন না, বা ভাড়া ইত্যাদি কিছু পান না, কিন্তু তবু তারা ধনী; ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, ব্যাঙ্ক কারবারীরা নিজেরা উৎপাদন করে না, অন্যকে শোষণ করে সম্পদ জমায় না। তাদের সম্পদ উৎস যাই হোক না কেন, এটা বুঝতে হবে যে তা আসছে সমাজে সৃষ্টি সম্পদের অংশ হতেই।

আমরা বলেছি, শ্রমিকের মেহনতই সম্পদ সৃষ্টি করে, উৎপাদকেরা এর থেকে যেটুকু পায় সেটা ছাড়া সবটাই যায় শোষকশ্রেণীর পকেটে। কিন্তু ঐ শোষকরা সৃষ্ট সম্পদের সবটাই নিজেরা ভোগ করতে পারে না, তা বিক্রি করে অন্য পণ্য কেনা যায়। এভাবেই ব্যবসায়ী ফাটকাবাজরা উদ্ভূত হয়, কেননা তবেই উৎপাদকেরা প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা বেচা করতে পারে। উৎপাদন করার জন্য কাঁচামাল কিনতে হয়। এভাবেই মালিকদের বাড়তি সম্পদের একাংশ ব্যবসায়ীদের ভাগে আসে, ব্যাঙ্ক কারবারীদের ক্ষেত্রেও তাই। লাভ, সুদ, মধ্যস্থ ব্যক্তির কমিশন, সবই আসে উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে। যে সম্পদ মালিক উৎপাদকদের থেকে কেড়ে নেয় উৎপাদন সামগ্রীতে তার একচেটিয়া আধিপত্য থাকার দরুন। শুধু টাকা দিয়ে আরও টাকা আসে না, ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক লেনদেন করেও তা হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবসার

আসল ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন পক্ষ সৃষ্ট মোট সম্পদ থেকে কতটা আয়ত্ত করতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবসার রহস্যই এই, বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে এর নানা জটিল কারিকুরিই শিক্ষা দেওয়া হয়।

মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা সম্পদ সৃষ্টি করে না। উৎপাদন সামগ্রী আয়ত্তে থাকার সুবাদে শোষকদের হাতে যে সম্পদ জমা হয় তার থেকেই অন্য অংশের লোকেরা ভাগ পায়। এমনকি অধ্যাপক, আইনবিদ, ডাক্তাররাও ঐ একই সম্পদ থেকে ভাগ নেয়, যদিও তারা অবশ্য উৎপাদকদের প্রাপ্ত সম্পদের থেকে সরাসরি কিছু অংশ পায় তাদের কাজ করার সুবাদে।

এবার সার কথা বলা যাক। সম্পদের অসাম্যের উৎস হল প্রাকৃতিক শক্তি—উৎপাদনের সামগ্রীর ব্যক্তিগত মালিকানা। এর থেকেই সৃষ্ট হয় অর্থনৈতিক শোষণ—শ্রমিকবা যা উৎপাদন কবে তার কিয়দংশ তাদের ন্যূনভাবে জীবন ধারণের জন্য দিযে বাকিটা পকেটস্থ করা। এটা সরাসরি হয় যখন শ্রমিক মালিকের কাছে নিযুক্ত থেকে উৎপাদন করে, অপ্রত্যক্ষভাবে হয় যখন মানুষ জমি ভাডা নেয় অথবা জীবন ধারণের জন্য অন্য কিছু ভাড়া নেয়। আদিকালে উৎপাদন সামগ্রী ব্যক্তিগত মালিকানায় আসে দৈহিক শক্তির মাধ্যমে, একে বলা হয় 'আদিম সঞ্চয়'। শক্তি দিয়ে উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের এই ধারা পববর্তীকালে ক্রীতদাস-প্রথা, ভাডাটে দাস শ্রমিক ব্যবস্থা থেকে সুরু করে গত শতাব্দীর ভারত থেকে সম্পদ লুণ্ঠন এবং কতিপয় ইংরেজ-জার্মানের আবিষ্কারের সূত্রে শিল্প বিপ্লবে পরিণতি পায়। এটা এক অভূত-পূর্ব শোষণ যুগে পর্যবসিত হয়, কেননা এই ব্যবস্থায় একজন মালিকের অধীনে একসাথে বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয়। বর্তমানে সম্পদের অসাম্যের এই কারণ থেকেই সমাজতান্ত্রিক পথে এর সমাধান কী হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

সমাধান সূত্র

তাত্ত্বিক দিক থেকে দুভাবে এর সমাধান সম্ভব, এর দুটোই সফল হলে সমসমাজ গড়া সম্ভব। প্রথমতঃ, সমাজকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে সবাই স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করতে পারে, কারোর শ্রম না নিয়ে নিজের জমিতে চাষ বা নিজের যন্ত্র দিয়ে উৎপাদন করতে পারে। একজনের ক্ষমতা যতটা তার বেশি উৎপাদন সামগ্রী কেউ পাবে না। এভাবে সমাজ পুনর্গঠন

করতে হলে সবকিছুর আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। এমন এক সমাজ চালু রাখতে কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা দরকার, সাবেক অর্থনৈতিক সংস্থা আছে এমন সমাজে তা সম্ভব নয়। সেই সমাজে রেল বা ডাক-তার থাকতে পারে না, শুধু প্রাচীন আমলের যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে পারে। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে তেমন সমাজ খুব দুর্বল ও ভঙ্গুর হবে, এবং সহজেই শিল্পোন্নত দেশের আওতাধীন হবে। জীবনযাত্রার মানের দিক দিয়ে মানুষের জীবন, বিশেষ করে ভারতের মতো জনবহুল দেশে জীবনমান অত্যন্ত নিম্ন হবে, কারণ মাথাপিছু উৎপাদন হবে অত্যন্ত কম।

মোট কথায়, এই পথে সমাধান বাস্তব নয়, বর্তমান অবস্থাব নিরসনে এই সমাধানসূত্র অনুসরণ করা নানা কারণেই কাম্য নয়। তাছাড়া, একনায়কতান্ত্রিক শাসন ছাড়া এ ব্যবস্থা কার্যকরী করা অসম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক সমাধান

ওপরে সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়েছে তাব থেকে এটা স্পষ্ট, সমাজতান্ত্রিক উপাযে এর সমাধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে। ব্যক্তি মালিকানার অবসান করে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, আর্থিক অসাম্যের বিলুপ্তি ; অন্য কথায়, সমাজের মূল অভিশাপ থেকে মুক্তি। আমরা আগেই আলোচনা করে দেখেছি, ব্যক্তিগত হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার উৎস হচ্ছে শ্রমের অবাধ শোষণ। সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে একে অন্যের শ্রম শোষণ করতে পারবে না। ব্যক্তি অন্যের জন্য নয়, নিজের জন্যই কাজ করবে, ব্যক্তিগতভাবে নয়, গোষ্ঠীগত স্বার্থে কাজ করবে। তারা যা উৎপাদন করবে, তা অন্যের মুনাফা লোটার মাধ্যম হবে না, নিজের ব্যবহারে কাজে লাগবে। সামাজিক মালিকানার অর্থ হচ্ছে, সমগ্র সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং সমানভাবে তা বন্টিত হবে। প্রথমে এই বণ্টনের ভিত্তি হবে কাজের পরিমান ও মান পরে ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন করা হবে সবকিছু। সমগ্র উৎপাদনের একাংশ তুলে রাখা হবে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, স্কুল, হাসপাতাল ও সাধারণ কাজের জন্য, বাকীটা সমভাবে বন্টিত হবে।

এটাই সমাজতন্ত্রের মূল নীতি—উৎপাদন সামগ্রীর সামাজিক মালিকানা।

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রথম কাজই হচ্ছে উৎপাদন সামগ্রীর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করা।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে এক কথায় এটা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে উদ্দেশ্য সফল করতে হলে দেশের বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত করে এমন সব মূল উৎপাদন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধন করা আবশ্যক। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সামগ্রীর সাথে সাথে বীমা, ব্যাঙ্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার স্থানে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উৎপাদনের চাকা সচল রাখতেই তা করা অপরিহার্য। প্রথম মূলক্ষেত্রসমূহের সাথে সাথেই দ্বিতীয় সহযোগী মাধ্যম-সমূহেরও সামাজিকরণ আবশ্যক।

ভারতীয় পরিস্থিতি

প্রথমেই পরিষ্কার বলতে চাই, আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের ওপর গুরুত্ব দিয়েই সবকিছু করতে সপ্রতিজ্ঞ। তা না করলে অত্যন্ত অনৈতিহাসিক, অমার্কসীয় কাজ হবে, আমার সাধ্যমত ভারতীয় সমাধান সমূহ বিচার করে দেখেছি, সমাজতান্ত্রিক সমাধানই এর একমাত্র বিকল্প। প্রাচীন ভারতের সমাজ-দার্শনিকদের প্রতিভার সম্মান দিয়েই বলছি, ভারতীয় সমাজ এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সমস্যাবলীও এত নতুন রূপ পাচ্ছে যে অতীতের ধ্যানধারণা এর সাথে তাল রাখতে পারছে না। কতগুলি মোদ্দা ব্যাপার আছে যা সব যুগে ও সব স্থানে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণের দায় যখন থাকে তখন ঐসব পুরনো ধ্যানধারণা সেকেলে পরিগনিত হয়। এই সব ক্ষেত্রেই পুরনো ব্যবস্থা ও ভাবনা ভেঙ্গে পড়ে, নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দরকার হয়।

পুরনো ভাবনা ও নীতিসমূহ রচিত হয়েছিল সভ্যতার সরল' সহজ রূপের পরিপ্রেক্ষিতে। শিল্প ও কৃষি এমন স্তরে আসে নি যখন একে অন্যের শ্রম শোষণ করার অবকাশ পেত। সব উৎপাদনই ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসংখ্যাও ছিল সীমিত প্রকৃতি ছিল সদয়, সুন্দর। যে কোনো ব্যক্তি একাই জঙ্গল সাফ করে সেই জমিতে পরিবার নিয়ে বাস করতে পারত।

বর্তমানের শিল্প ও কৃষি সমস্যাসমূহ এর চেয়ে বহু জটিল রূপ পেয়েছে।

জমিদারী প্রথা অভারতীয় সংস্থা বিশেষ, মিল ও কারখানাও এদেশে নতুন। উপনিবেশিক প্রাধান্যের ফলে যেসব সমস্যাবলীর উদয় হয়েছে তাও নতুন। আমাদের সমাজের মূল সমস্যা বহুর ওপর কতিপয় ব্যক্তির শোষণ—যার উৎস জমি ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর ওপর একচেটিয়া মালিকানা—এই সমস্যা মনুর আমলে এমনতরো ছিল না।

সমাজতন্ত্রের জাতীয় সীমানা নেই

প্রাচীন যুগের ভারতের সাথে বর্তমান এই সমস্যার কোনো যোগ নেই, বরং বর্তমান বিশ্বের সমস্যার সাথে একসূত্রে গ্রথিত। চীন, জাপান, বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা সর্বত্রই মানুষ এই সমস্যার সম্মুখীন। উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলে, অন্যকথায় বলা যায়, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বিদ্যুতশক্তির উদ্ভাবনের ফলে শোষণ এক অভূতপূর্ব বিরাট পরিধি পেয়েছে—পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনের ফলে এই শোষণ ব্যবস্থা নবরূপ নিয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত বলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ কোনো জাতীয় সীমানায় আবদ্ধ নেই। এর কোনো দেশ নেই, ইংলণ্ড, জাপান, জার্মান-এর মতো ভারতও এর দেশ। যেখানেই পুঁজিবাদী শোষণ থাকবে, সেখানেই সমাজতন্ত্র প্রসার লাভ করবে, ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়।

ভারতে সামন্ততান্ত্রিক চিহ্নসমূহের অস্তিত্ব থাকায় এর সমস্যা হয়ত কিছু বৈশিষ্ট্য পেয়েছে, কিন্তু মূলগত চরিত্র একই আছে। শোষিত মানব গোষ্ঠী-সমূহের মধ্যেকার ভারসাম্য হয়ত এদেশে একটু অন্য ধরণের হবে, হয়ত শ্লথভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আসবে—অন্যথায় পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনের উচ্ছেদ সাধনের প্রাথমিক দায়িত্ব উন্নত দেশের মতো ভারতেও মূল লক্ষ্য থাকবে।

ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমাজতন্ত্র

অনেকে বলেন, ভারতের অবস্থা একটু অন্য, এর ঐতিহ্য ভিন্ন, ভারত শিল্পে অনেক পেছিয়ে, কাজেই এদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবসম্মত নয়। এর পক্ষে যুক্তি যদি হয় যে সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহ ভারতে প্রাসঙ্গিক নয়, তবে এর চেয়ে মূর্খ যুক্তি আর নেই। যে প্রক্রিয়ায় সম্পদ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তা অন্য দেশের মতো ভারতেও সক্রিয় আছে, এবং

যেভাবে এই কেন্দ্রীকরণ রোধ করা সম্ভব, তা এদেশেও প্রযোজ্য। ভারতীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ সমাজতান্ত্রিক নীতি রূপায়নের স্তর ও প্রয়োগ পদ্ধতির একটু হেরফের হতে পারে বটে, কিন্তু মৌলিক নীতি একই থাকবে। শোষণ অবসানে ও বৈষম্য নিরসনে ব্যক্তি মালিকানার স্থানে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠাই যদি বিশ্বের অন্যত্র পথ হিসাবে গণ্য হয়, তবে তা ভারতেও প্রযোজ্য হবে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের বিষয়ে আমার ধারণা, দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে জীবন ও সুযোগ ভোগ করার রীতিতে আমরা অভ্যস্ত। অনেকে বলেন, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভারতীয় সভ্যতার এক মূল ধারা হিসাবে আছে, কাজেই এখানে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়, এতে উভয় আদর্শ সম্বন্ধেই ভুল ধারণা হয়। আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট প্রবণতা হিসাবে আছে ব্যক্তির উৎকর্ষসাধনের আদর্শ হিসাবে, পুঁজিবাদী সমাজের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অর্থে নয়। এবং ব্যক্তির চরম বিকাশই যদি লক্ষ্য হয়, তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সাধারণের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব, একথা সহজেই প্রমাণ করা যায়। ট্রটস্কী ত এক জায়গায় বলেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সাধারণ মানুষ প্ল্যাটো বা মার্কসের স্তরে আসতে পারে।

শিল্পে অনগ্রসরতা কোনো বাধা নয়। এই অনগ্রসরতার জন্যই হয়ত সমাজতন্ত্রের তীব্র বিরোধী শক্তি থাকবে। অনগ্রসর দেশে এর যথাযোগ্যতা প্রশ্নে রাশিয়ার দৃষ্টান্তই যথেষ্ট উত্তর। এজন্যই আমরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সপ্রতিষ্ঠ।

গ্রামের সমস্যা

কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিরাট অংশে গ্রাম থেকে এসেছে, এরা গ্রামের সব কিছুর পক্ষে। এরা কিছুটা ভুল বোঝবার জন্যই সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, কেননা তারা নাকি যন্ত্রের সমর্থক, এবং তাদের মতে, সেজন্যই সোস্যালিষ্টরা গ্রামের সুন্দর স্বয়ম্ভর অর্থনীতি ভেঙ্গে শহর গড়ে তোলার পক্ষে।

প্রথমেই শহরের বিরুদ্ধে এদের যাবতীয় বক্তব্য বলা থাক। শহরের ঘিঞ্জি বসতি, বস্তি, পয়ঃপ্রণালীর দুরবস্থা, নোংরা, যানজট ইত্যাদি আমাদের

বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং এজন্যই শহর মানেই বিভীষিকা, সুস্থ জীবনের পক্ষে বিপদস্বরূপ। বেশিরভাগ শহরবাসীর কাছেই নগর জীবন হচ্ছে এক অভিশাপ। শহরে মনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার, সিনেমা আছে বটে, কিন্তু এগুলি মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত করার পরিবর্তে হীন প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটায়, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল। তদুপরি, আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে শোষণের ওপর, শুধু গ্রামের মানুষ নয়, শহরের শ্রমিকদের শোষণ করে শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এই শোষণের পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ, এতে গ্রামই ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশি। শিল্প, বিলাসভবন, জ্ঞানবিজ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয় শহরে, গ্রাম হয় বঞ্চিত, শহরের তুলনায় অনুন্নত।

সবই সত্য, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজদেহের এই বিষম শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে একথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। সমাজতন্ত্র সামাজিক পরিকল্পনার এক মাধ্যম স্বরূপ, এর লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র সমাজের সুষম বিকাশ সাধন। সমাজতান্ত্রিক গ্রাম বা সমাজতান্ত্রিক শহর, কোনটাই বর্তমানের রূপে থাকবে না। এর যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বৈপরিত্যসমূহ উচ্ছেদ করতে সুসংবদ্ধ লড়াই চলবে।

একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রীরা যন্ত্রের প্রেমিক। কিন্তু তাদের কাছে যন্ত্র শোষণের হাতিয়ার নয়, কোনো নিমিত্ত বা উপাদান নয় যা দিয়ে মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিপীড়ন করা যায়। আমাদের যন্ত্র হচ্ছে শ্রমিকের বন্ধু—যা দিয়ে মানুষের শ্রম লাঘব করা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সমুদ্র ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জয় করা যায়। যন্ত্র আসলে রাক্ষুসে শহর সৃষ্টি করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করে বেকার বাড়াবে, এ মনে করা ভুল। যন্ত্র কতিপয় ব্যক্তির করায়ত্ত হয়ে তাদের মুনাফা লোটার কাজে ব্যবহৃত হলে এইসব ভয়াবহ অবস্থা হবে ঠিকই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজে এই শক্তির ও উৎপাদনের সামগ্রীর যথার্থ ব্যবহারে সব মানুষ উপকৃত হলেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, এটা ধরে নেওয়া অবাস্তব।

সমাজতন্ত্রে শহর হবে পরিকল্পিত, কেন্দ্রীকরণ এড়িয়ে চলা যাবে কেননা শিল্প স্থাপিত হবে ছড়িয়ে। সংখ্যাতত্ত্বগত পরিকল্পনা ত বটেই, ভৌগলিক পরিকল্পনাও রচিত হবে। অন্যদিকে গ্রাম গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র কুটিরপুঞ্জকে কেন্দ্র করে; বহির্জগতের হলাহল থেকে দূরে, পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে প্রগতিশীল

গোষ্ঠীসমাজ ; টেলিফোন, রেডিও, বৈদ্যুতিক ট্রেনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে যোগসূত্র থাকবে। শহরের মতো গ্রামও হবে শিল্প উৎপাদনের একক, সেখানে থাকবে স্বশাসিত সরকার, স্কুল, মিউজিয়ম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

সমবায় প্রথা ও রাষ্ট্রীয় খামার

ভারত মূলতঃ কৃষিভিত্তিক দেশ। যুক্তি দেওয়া হয়, এজন্যই এদেশে সমাজতন্ত্র দিয়ে কিছু হবে না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে, উৎপাদনের উৎসসমূহের বিকাশ হওয়ার ফলে অবস্থা এমন হয়েছে, যে কোনো দেশেই আজ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব, সে যত অনগ্রসর দেশই হোক না কেন। ভারতে এমন কোন শাসক পার্টি যদি থাকে যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী, দেশ কৃষিপ্রধান হওয়ার দরুন তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময়কাল হয়ত একটু বেশি হবে, তাছাড়া কিছু নয়।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না সেটা আসল প্রশ্ন নয়, ভারতীয় কৃষি, কৃষক, দেশের মানুষ তথা জাতি এর দ্বারা লাভবান হবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে জোর দিয়েই বলি, একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতীয় কৃষির ধ্বংস রোধ করে জাতিকে শক্ত সবল করতে সক্ষম।

ভারতীয় কৃষির সংকট এমন পর্যায়ে পেঁৗচেছে যে আমূল সংস্কার ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। মোটামুটি কয়েকটি রোগ রয়েছে: জমিতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা কৃষককে শুধু বঞ্চিতই করে না, তাকে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় নামায়, উচ্চহারে কর, ঋণের বোঝা চরম, খণ্ড খণ্ড জমি হওয়ায় তা অনর্থনৈতিক হয়ে ওঠে, বাজারীকরণের অসুবিধা, ঋণের সীমিত সুযোগ, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব, গ্রাম শহরের অসাম্য।.

এর যে কোনো একটা সমস্যাই যথেষ্ট, সবগুলি একত্রে দেখা দিলে কোনো সম্ভাব্য সংস্কারই যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায়, কর্ষণকারী চাষীকে শোষণ করে এমন সব কায়েমী স্বার্থ ভাঙ্গতে হবে, সব কৃষিঋণ মুকুব করা, বিখণ্ডীকৃত জমি ঐক্যবদ্ধ করে সমবায় ও গোষ্ঠি খামারে চাষ, রাজ্য ও সমবায়ের মাধ্যমে ঋণদান ও বাজার ব্যবস্থা, এবং সমবায় প্রথায় সহযোগী শিল্প স্থাপন।

এগুলি ক্ষতিকারক ভাবনা নয় আদৌ। এর অর্থ জমির মালিক ও চাষীদের শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান। এছাড়া, এর সবটাই গঠনমূলক,

এটা করার জন্য চাই রাষ্ট্রের সহাযতা, প্রচার ও উৎসাহ। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায তাঁব আগ্রা বক্তৃতায বলেছেন, যতক্ষণ না গ্রামের ক্ষুদ্র জমিকে সংহত করে সমবায খামারে পবিণত করা হচ্ছে এবং কৃষিকে সমগ্র গোষ্ঠির কাজ হিসেবে পবিণত কবা হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতীয কৃষির কোনো উন্নতিই সম্ভব নয।

যারা সমবায প্রথায এবং গোষ্টিগতভাবে চাষবাসের কথায ভয পান, তারা হযত বলবেন যে দক্ষ যোগ্য অর্থনৈতিক ভূমি স্বত্বের অধিকারী কৃষক মালিকদেব হাতে সব ছেড়ে দিলে কৃষির উন্নযন হবে। আমাদের উত্তর হচ্ছে, তা কবতে হলেও বর্তমান ব্যবস্থার আমূল সংস্কাব চাই এবং সংস্কাব সাধিত হলেও সুফল পাওযা যাবে না। কৃষক ও মালিক উভযের তবফেই তা ক্ষতিকারক হবে। কৃষকেব দিক থেকে দেখতে গেলে এই ব্যবস্থায মালিক কৃষকের ঝুঁকি থাকবে বেশি, এবং সমবায খামাবেব কৃষকের তুলনায ব্যক্তি মালিক কৃষক বিক্রেতা ক্রেতা ও উৎপাদক হিসাবে অনেক বেশি অসুবিধার মধ্যে পডবেন। অন্যদিকে বড সমবাযেব যেসব সুবিধা, সে তা পাবে না। নৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও সে ব্যক্তি হিসাবে অনেক অনগ্রসব হযে থাকবেন, কেননা সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গোষ্ঠী স্বার্থে একাগ্র সমবায চাষীব চেযে ব্যক্তিমালিক কৃষক মানুষ হিসাবে অনেক পেছিযে থাকবে। আর জাতীয স্বার্থের দিক থেকে দেখলে আমাদের প্রস্তাব অনেক বেশি শক্তিশালী। এবং এটা ত জানা কথা যে কৃষকও জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অন্য দেশের মতো এদেশেও সমাজতন্ত্র দরকার, কেননা উপনিবেশিক শোষণে এখানকার জীবন বিধ্বস্ত হয়ে আছে। ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতে কোনো পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বণ্টন পরিকল্পিত উপাযে করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা করতে হলে আগে ঠিক করতে হবে কোন ফসলের চাষ কতটা করা হবে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য, কিসেব কারখানা স্থাপিত হবে, কী খাবার দরকার জাতির, কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হবে। এসব করা সম্ভব নয ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতে। এটা সম্ভব তখনই যখন পুরো গ্রাম একটি উৎপাদন একক হয়ে কাজ করবে, এবং তা করবে সামগ্রিক অর্থনীতির অংশ হয়ে। এটা ঠিক, রাষ্ট্র বিধিনিষেধাজ্ঞা দিয়ে বিশেষ ফসল উৎপাদন কমাতে

বাড়াতে পারে ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতেও। কৃষিতে নিয়ন্ত্রণ জারী সম্ভব এইভাবে, রাশিয়ায় তা করা হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পরিকল্পনার পথে এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক হবে না ততটা।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা ধরা যাক, যদি ঠিক হয় কয় বছরের মধ্যে ভারতেব কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ কবতে হবে, তবে কী তা ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতে সম্ভব? কৃষক মালিককে উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা যায়, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয। জমি যেখানে ব্যক্তি মালিকানায ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত, সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি ইচ্ছামতো করা সম্ভব নয়।

কৃষি ও শিল্পেব মধ্যে ভারসাম্যের প্রশ্ন রয়েছে। এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কৃষি সমস্যার সমাধান নেই, কিন্তু ভাবসাম্য আনতে আবার সমবায়-মূলক চেষ্টা ও পরিকল্পনা দবকার, ব্যক্তি মালিকানার কৃষি এর প্রতিবন্ধক।

মনস্তত্ত্বেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যা বিচার করলে দেখব, কৃষিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সমবায ও গোষ্ঠী খামার কৃষি ব্যবস্থা ছাড়া সমাজবাদী ভিত্তিতে ভারতীয় জীবন পুনর্গঠিত কবা সম্ভব নয়। অনেকে প্রশ্ন করেন আমায়, শিল্পে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবে কৃষিটা ব্যক্তি মালিকানায ছেড়ে দেওয়া হোক না। আমাদের উত্তব, এ ধরণের দ্বিমুখী ব্যবস্থা—এক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা অন্যক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা আরো সংঘাত ও সংকট সৃষ্টি করে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করবে। লক্ষ লক্ষ কৃষক যারা নিজ জমিতে উৎপাদন করবে লাভের জন্য, সংকীর্ণ স্বার্থবাদী এইসব কৃষকদের নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে গ্রামে শহরে সর্বত্র গোষ্ঠী মানসিকতা ও সমাজজীবন গড়ে তুলতে হবে। কাজেই যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার কবা হোক না কেন, ভারতীয় কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করতেই হবে।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি কী, সমবায় ও গোষ্ঠি খামারই বা কী? প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ কম্যুন সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি। ভারতে এটা সবচেয়ে প্রাচীন বা সাধারণ গ্রাহ্য প্রথা নয়, মনুস্মৃতিতে এর কোনো উল্লেখ নেই। তবে ভারতের ইতিহাসের একটা বিরাট পর্বে ভারতীয় সীমানার মধ্যে এ ধরণের গ্রাম যে ছিল এ নিয়ে বিরোধ নেই। এর আদি যাই হোক না কেন এই ব্যবস্থায় জমির গোষ্ঠী মালিকানা এবং একসাথে উৎপাদন প্রথার প্রচলন ছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মাদ্রাজে এ ধরণের গ্রাম ছিল।

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য এই পথেই উদ্দীষ্ট, তবে সমাজতান্ত্রিক গ্রাম একটা বদ্ধ

সীমায় আবদ্ধ হবে না, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহযোগী অংশ হয়ে কাজ করবে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে দুই প্রথায়, কি তিন প্রথায় সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ে উঠেছে। প্রথমটা হচ্ছে, সহজ সরল সমবায় প্রথায় চাষ। এই ব্যবস্থায় জমির ওপর ব্যক্তির মালিকানা বহাল থাকে (যদিও জমিদার ও পুঁজিপতি মালিকদের জমি পুনর্বণ্টন করে মালিকানায় অসাম্য কমিয়ে ফেলা হয়), কৃষি সরঞ্জাম, ঘোড়া ইত্যাদি কৃষকেরই থাকে, কিন্তু চাষের সময়ে সব জমি সংহত করে চাষ করা হয়, উৎপাদন ও শ্রম সংঘবদ্ধ আকারে করে উৎপাদন বণ্টিত হয় খরচাপাতি মিটিয়ে জমির আয়তন অনুযায়ী। সামাজিক জীবনচর্যার এই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা। এই ব্যবস্থা গোষ্ঠী মানসিকতা উদ্বুদ্ধ কৃষকদের মধ্যে গোষ্ঠী জীবন ও গোষ্ঠীর জন্য শ্রমে করে।

এর পরের স্তর হচ্ছে গোষ্ঠী খামার, এতে জমিতে কোনো ব্যক্তি স্বত্ব থাকে না, উৎপাদন বণ্টনের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমের পরিমাণ। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাও বিবেচ্য। তবে গোষ্ঠী খামারের গ্রামেও উৎপাদন সরঞ্জামে থাকে ব্যক্তির স্বত্ব, চাষের গরু, শুয়োর ও ঘোড়াও থাকে ব্যক্তির। এর থেকে তৃতীয় স্তরে কম্যুনের উদ্ভব, যেখানে গোষ্ঠীজীবন সর্বোচ্চভাবে অনুসৃত। রাশিয়ার মতো ত্বড়িৎগতি হবার দরকার নেই, আমরা ওখানকার মতো অত জবরদস্তিও প্রয়োগ করব না। শিল্পক্ষেত্রের মতো কৃষিতে জোর করে সামাজীকরণের কথা আমরা বলি না। সমবায় ও গোষ্ঠী খামারের জন্য প্রচার শিক্ষা সাহায্য কর বদ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহদান চলুক।

দেশের বিশাল জনসংখ্যা বিচারে আমরা রাশিয়ার মতো অত শ্রম বাঁচানো যন্ত্র ব্যবহার করব না, তবে এর অর্থ এই নয় যে সাবেক প্রথার লাঙ্গল সংস্কার করব না। যতক্ষণ না গ্রামের বাড়তি মানুষ শিল্পের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে ততদিন জমিতে ট্রাকটর চারা রোপনের যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করব না। গ্রামে বৈদ্যুতীকরণ করব, রেডিও পৌছে দেব। পশ্চিমের অনুকরণ নয়, স্বাঙ্গীকরণের মাধ্যমেই আমরা পথ বেছে নেব।

অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন যে সোশ্যালিষ্টরা সব জমি কেড়ে নেবে। কৃষকের থেকে জমি কেড়ে আমরা যেন অন্য মহাদেশে পাঠিয়ে দেব! জমি যথাযথ থাকবে, আমরা চাই সমাজের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, তার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছানো। আমাদের লক্ষ্য সামাজিক কল্যাণ সাধন।

তিন ঃ সমাজবাদ ঃ মত ও পথ

সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায় যে সমাজবাদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজবাদ কি—এই প্রশ্নের সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া কঠিন। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজবাদী মনীষী ও কর্মী সমাজবাদ সম্বন্ধে নানা মতবাদ ও চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। যখন আমরা এই সমস্ত সমাজবাদী ধারাসমূহেব বিশেষ কোন একটাকে নিয়ে আলোচনা করি, তখন এই বিভিন্নতা অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যদি আমরা মার্কসবাদকে গ্রহণ করি বা মার্কসবাদী চিন্তার অনুবর্তী হই, যেমন আমি নিজে, তখন এই বিভিন্নতা অনেকাংশে কমে আসে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। আধুনিক বিশ্বে মার্কসের প্রতি অনুগত বহু সমাজবাদী ধারা সক্রিয় আছে। কিন্তু এদের মধ্যকার পার্থক্যও গভীর। এরা পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদ, এমন কি মারামারি কাটাকাটি করে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ষ্টালিন ও ট্রট্স্কী পন্থীদের কথা বলা চলে। এঁরা উভয়েই মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্যশীল, কিন্তু এঁদের পদ্ধতি পরস্পর থেকে কেবল স্বতন্ত্র নয়, এঁরা একে অপরের রক্ত পিপাসু। এই দুই মার্কসবাদী ধারার মধ্যে কোনটিতে সত্যিকার সমাজবাদী চিত্র ফুটে উঠেছে? যাঁরা এই যুদ্ধরত পক্ষে নেই, তাঁরা নিঃসন্দেহে বলবেন কোনটিতেই নয়।

আমাদের দেশে কমিউনিষ্ট ও রায়পন্থী উভয়েই নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, মার্কসের নামে এঁরা কি ধরণের সমাজবাদী নীতি পরিচালনা করে এসেছেন। ম্যাক্সওয়েলের ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজ করা এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর গুপ্তচরগিরি করাও তাঁদের মার্কসবাদ কর্মধারায় অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, এই মার্কসবাদী দলদ্বয়ও একে অপরকে চরম শত্রু মনে করে থাকে। মার্কসীয় রঙে রঞ্জিত আরও ছোটখাট বহু দল উপদল আমাদের দেশে আছে। কিন্তু মার্কসবাদ বলতে কি বোঝায়, এই সম্বন্ধে তাঁরা কখনও কোন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি।

এই সব বিভ্রান্তি ও সংঘাতের দরুণ আমার মনে হয়, মার্কসবাদী

চিন্তাধারা ও মার্কসোত্তর বিশ্ব-ইতিহাস, এবং আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঐতিহাসিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজস্ব একটি সমাজবাদী চিত্র অঙ্কন করা একান্ত প্রয়োজন। মার্কসবাদ হল সমাজ-বিজ্ঞান এবং সমাজ বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সমাজ-বিপ্লবও তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মার্কসবাদী চিন্তাধারায় কোন প্রকার গোঁড়ামি বা মৌলিকতাবাদ নেই। যাঁরা একদিকে মার্কসবাদকে বিজ্ঞান বলে থাকেন, আবার অপর-দিকে তার মধ্যে গোঁডামি ঢুকিয়ে দিতে চান, তাঁবা মার্কসবাদের চরম ক্ষতিই করে থাকেন। বিজ্ঞানে শেষ সত্য বলে কিছু নেই। মানুষেব জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অজ্ঞানতা দুর করেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

মার্কসবাদ যদি বিজ্ঞান হয়ে থাকে, মার্কস তাহলে শেষ সত্য আবিষ্কার করে যেতে পারেননি। তিনি কেবল সে সত্যের সন্নিকটবর্তী হয়েছিলেন। আজকে মনুষ্য জ্ঞানভাণ্ডারের এই বিপুল বিস্তার ও বৃহত্তর অভিজ্ঞতা নিয়ে, এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে আবও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা মার্কস অপেক্ষাও সেই সত্যের অধিকতর সন্নিকটবর্তী হতে পারি। মার্কসের অসীম কৃতিত্ব এই যে, ডারুইন যেমন জীবনকে বোঝার পদ্ধতি দিয়ে গেছেন, তিনিও তেমনি আমাদের ইতিহাসকে উপলব্ধি করার, এমনকি তাকে পরিবর্তন করারও পদ্ধতি দিযে গেছেন। ডারুইনবাদ ও মার্কসবাদ প্রায় সম-সাময়িককালেরই, কিন্তু আজকে এমনকি একনিষ্ঠ ডারউইনবাদীও ডারউইন আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তথাপি তিনি অতি গর্বের সাথেই নিজেকে ডারুইনবাদীবলে পরিচয় দিয়েথাকেন। উইলকনসিন্'এ জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিশ্ব গ্রন্থরাশির মধ্যে বাইবেলের পরেই Origin of the Species-কে স্থান দিতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ডারুইনবাদকে কোথায় ভ্রান্ত বা কেবল আংশিক সত্য প্রমাণিত করেছে, সে কথা দেখাতে গিয়ে তিনি ক্ষণেকের তরেও মনে করতেব না যে, এতে গুরুর প্রতি কোন প্রকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। একজন মার্কসবাদীর বেলায়ও সেকথা সমভাবে প্রযোজ্য। Capital-কে বিশ্বের গ্রন্থরাশির মধ্যে অদ্বিতীয় মনে করেও মার্কসবাদকে সমৃদ্ধতর এবং তার আংশিক সত্যগুলির উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সমাজবাদ

সমাজবাদী সমাজ সৃষ্টির সাথে দুইটি অধ্যায় জড়িত, রূপান্তর-ক্ষণ ও সমাজবাদী-স্তর। একথা সত্য, এই রূপান্তর-ক্ষণ আমাদের বর্তমান পরিবেশ, তার পরম লক্ষ্য, অর্থাৎ আমাদের ঈপ্সিত পূর্ণ সমাজবাদী আদর্শের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হবে।

প্রথমে আমি পূর্ণ সমাজবাদী সমাজের কথাই আলোচনা করব।

সমাজবাদের লক্ষ্য হল : সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও শোষণের অবসান করা ; আত্মোন্নতির জন্য সমাজের সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেবার সুবন্দোবস্ত করা, সমাজের প্রাকৃতিক ও নৈতিক সম্পদসমূহের উন্নতি বিধান করা, এবং সে সমস্ত সম্পদ-রাশি ব্যক্তি বিশেষের মুনাফার জন্য নিবদ্ধ না রেখে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনে এবং সামাজিক ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করা ; যারা শ্রম করে এবং সমাজের সেবা করে, জাতীয় সম্পদসমূহ, সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক এবং অপরাপর কাজগুলো তাদের মধ্যে যথাযথ-ভাবে বণ্টন করা।

যে সমাজে এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেই সমাজই সমাজবাদী সমাজ এবং যেখানে নেই, তা সমাজবাদী নয়। পূর্ব্ব-পরিকল্পিত কোন মতবাদ, যে কেউ এর উদগাতা হোন্ না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তা যদি এই সমস্ত লক্ষ্য সাধনের সহায়তা না করে, সেই মতবাদ গ্রহণ করা বা তার দ্বারা বিভ্রান্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

মৌলিক পরিবর্তন

আমার বিশ্বাস, যদি আধুনিক সমাজের কতকগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা যায়, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা যায়, কেবল তখনই এই সমস্ত আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, দেশের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। সমাজবাদের পথে স্বদেশের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য, বৃটিশ বা কারও অধীনে কোন সমাজ-বাদই সফল হতে পারে না, এ কথা বেশী করে বলার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়তঃ, দেশে বর্তমানের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধাভোগী কোন শ্রেণী, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোন কায়েমী

স্বার্থ থাকতে পারবে না। আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়, প্রভুত্বকারী রাজন্যবর্গ ও জমিদার শ্রেণী এবং ধনীদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা বর্জন করতে বাধ্য করতে হবে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর, রাজন্যবর্গ শাসন এবং জমিদারী ও ধনবাদী-ব্যবস্থা বিনষ্ট করা অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়ে উঠবে। যদি ভারতীয় জনসাধারণ বৃটিশ শক্তি ধ্বংস করার মত যথার্থ শক্তির পরিচয় দিতে পারে, ইচ্ছা করলে অনায়াসে তারা সামন্ততন্ত্র ও ধনবাদের ভিত্তিও বিচূর্ণ করে দিতে পারে, কোন বাধাই তাদের পথ-রোধ করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এই পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক হল, জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতন্যের অনগ্রসরতা। যদি আমাদের সমাজবাদী আন্দোলন দেশের জনসমাজকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে বিশেষ বাধা বিপত্তি ছাড়াও এদেশে এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

রাজন্যবর্গের রাজ্যাবসানের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ কোন সমাজবাদী সমাধানের প্রয়োজন নেই। বুর্জোয় সমাজেও তার তৈরী সমাধান পাওয়া যায় এবং আমরা বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। রাজন্যবর্গকে গদিচ্যুত করে সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাদের ভৌগলিক পরিবেশ, অর্থ নৈতিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিকভাবে সংলগ্ন রাজ্যসমূহের সাথে সংযুক্ত করে সীমা নির্দ্ধারণ করতে হবে।

জমিদারী প্রথার অবসান আমাদের কৃষি-অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এর সাথে আদর্শ ও বাস্তবের বহু দুরূহ প্রশ্ন জড়িত। সমাজবাদী ভারতে কোন জমিদার থাকবে না, কেবল এ কথা বললে আমরা দেশে কি ধরণের কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাই, প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধে সমস্তই অব্যক্ত থেকে যায়।

ধনবাদের ধ্বংস সাধন যে সমাজবাদের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবল একে সমাজবাদ বলা চলে না। এই ধ্বংস সমাজবাদের নেতিমূলক একটা দিক মাত্র, এর গঠনমূলক দিকও গড়ে তুলতে হবে। কিভাবে ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করা যাবে এবং তার পরিবর্তে কে তার স্থান অধিকার করবে, সেটা আমরা কি ধরণের সমাজবাদ চাই,

তার উপর নির্ভর করবে। ভারতবর্ষের সমাজবাদী শিল্প সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব।

কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে হবে। তাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠবে। আমি প্রথমে আমার সমাজবাদ চিত্রের অর্থ নৈতিক অংশ নিয়েই আলোচনা করব।

কৃষি

সর্বপ্রথমে আমি আমাদের দেশের কৃষি-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের দেশের সর্বপ্রকার জমি-ব্যবস্থাই অত্যন্ত জটিল ও ঘোরালো। কিন্তু সর্ব্ব-ব্যবস্থাতেই মুষ্টিমেয় জমিদার ও বিত্তবান-শ্রেণীর স্বার্থের জাঁতায় চাষীরা উৎপীড়িত হয়। এই সমস্ত উৎপীড়ক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দিতে হবে এবং সেই স্থানে নতুন কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার পথে সমবায় ও সামগ্রিক, এই দুই প্রকার স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এখন আমি স্বভাবতই এখানে প্রথম স্তর নিয়ে আলোচনা করব।

জমিদারী প্রথা অবসানের পর জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃহত্তর জমিগুলোকে বিখণ্ডিত করে ক্ষুদ্রতর জমিগুলি প্রয়োজন মত সম্প্রসারিত ও উপযুক্ত ফসল ফলনের উপযোগী করে তোলা যায়। কোন চাষীর নিকটে নির্দ্ধারিত উর্দ্ধসংখ্যা—৩০ একর থেকে বেশী এবং পাঁচ একর থেকে কম জমি থাকতে পারবে না। যিনি গ্রামে বাস করেন না এবং নিজে চাষ করেন না, তিনি জমির মালিক হতে পারবেন না। গ্রামই হবে কৃষি-অর্থনীতির প্রাথমিক ইউনিট।

এই জমিগুলির ন্যায্য মালিক হবে গ্রাম এবং রাষ্ট্র-নির্দ্দিষ্ট আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহকেই জমি বিলি-ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। এইভাবে নির্দ্ধারিত জমির উপর চাষীদের একপ্রকার সত্ত্বাধিকার জন্মে যাবে। কেবল সুষ্ঠুভাবে জমির পুনর্বণ্টন ও চরম অসাম্য নিবারণ করা ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে চাষীদের বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিন্তু এই সত্ত্বাধিকার কেবল চাষীর জমির পরিমাণ অনুযায়ী গ্রাম্য জমির উৎপাদিত শস্যের অংশ গ্রহণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। কোন চাষীকে

গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যতীত কারও নিকট জমি বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া যাবে না। স্বতন্ত্রভাবে জমি-চাষ বা কৃষি-বিষয়ক অপরাপর কার্যাবলী পরিচালনা করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে অপরাপর নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলীর সাথে কৃষি-সমবায়ের কাজও করতে হবে। এই সমবায়কে বেচা কেনা ও ধার লেন দেন করা এবং অপরাপর কার্যাবলী পরিচালনা করতে হবে। যে সমস্ত শ্রমিক জমিতে কাজ করবে, রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী অর্থ বা উৎপাদিত শস্যের দ্বারাই তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, এবং উৎপাদন খরচ বাবদ কিছু অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্য জমির মালিকানা অনুযায়ী চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

এই হল সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার সমবায়-স্তর। এর পর হল, সামগ্রিক-স্তর যেখানে জমির উপর চাষীদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে পারবে না। (রাশিয়ায় প্রত্যেক সামগ্রিক-চাষীকে তার বাসস্থানের চারিদিকে শাকসব্জীর বাগান, পশুপক্ষী পালন এবং অনুরূপ কাজের জন্য তিন একর করে জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে।) এবং গ্রাম্য সামগ্রিক সংগঠন সমূহ (village collectives) গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি বা কৃষি-কেন্দ্রগুলির মালিক ও পরিচালক হয়ে উঠবে। অগণিত লোকক্ষয় ও নিষ্ঠুর একনায়কত্বের দ্বারা রাশিয়াতে সামগ্রিক-পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং এর ফলে রুশিয়ার দুই কোটী চাষী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি শ্রমজীবী জনসাধরণের উপর এই ব্যাপক নিপীড়ননীতি সমর্থন করি না, সমাজবাদও তা অনুমোদন করে না। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জমির পুনর্বণ্টন এবং বৃহৎ মালিকানাগুলির বিখণ্ডীকরণে সম্ভবতঃ কৃষি-সমাজের শতকরা বিশভাগের উপর রাষ্ট্র-নিপীড়ন-নীতি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সামগ্রিক পদ্ধতিতে শতকরা ষাট সত্তর জনের উপরই রাষ্ট্র-নিপীড়ন চালাতে হবে। শ্রমিকের নামে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত কোন দলের পক্ষে মেহনতি জনতার উপর এইপ্রকার ব্যাপক নিপীড়ন-নীতি গ্রহণ করা অন্যায়। শতকরা আশীজনের মঙ্গলার্থে বিশজনের উপর উৎপীড়ন করা যেতে পারে, কিন্তু শতকরা সত্তর জনকে, এমনকি তাদের মঙ্গলের জন্য ও নিপীড়ন করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সমবায় প্রথা প্রবর্তন করতেও বেশ কিছুটা নিপীড়ন-নীতির আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা ও বোঝানোর এক মহান সমন্বয় এবং কতকটা অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়েও এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে

পারে। এই পন্থা সমবায় পদ্ধতির সার্থকতা সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। অন্যথায় প্রথমেই সামগ্রিক-পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হলে চাষীদের উপর ব্যাপক উৎপীড়ন চালাতে হবে।' সমাজতন্ত্র হল, শ্রমিক শ্রেণীর অভিব্যক্তির প্রকাশ ; তাদের উৎপীডন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং সামগ্রিক-পদ্ধতিতে চাষ দ্বিতীয় স্তরে; অর্থাৎ সমবায়-পদ্ধতির পরে আরম্ভ করতে হবে ; এবং এর অগ্রগতি স্বভাবতই মন্থর হবে। প্রচার ও প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে একে এগিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত কৃষি-কেন্দ্র ও আবাদি জমিগুলিকে সমবায় থেকে সামগ্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন নেই। সে সমস্ত জমি প্রথম থেকেই সামগ্রিক-পদ্ধতিতে চলতে পারে এবং চলবেও। আমাদের বর্তমান কৃষি-অর্থনীতিকে বর্ণিত সমবায়-অর্থনীতিতে উন্নীত করলে কৃষক সমাজের বেশ একটা অংশ বেকার হয়ে পডবে। দেশের শিল্প এবং বিশেষ করে কৃষি-সহকারী শিল্পসমূহে তাদের নিযোজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।''

শিল্প

এখন আমি সমাজবাদী শিল্প নিয়ে আলোচনা করব। সমাজবাদী ভারতে আমি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই দুই প্রকার শিল্পের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। এ কথা না বললেও চলে যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই উভয় প্রকার শিল্প বর্ণিত কৃষি-ব্যবস্থার সহযোগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠবে।

সর্বপ্রকার বৃহৎ শিল্পই প্রাদেশিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীনে থাকবে। শিল্প পরিচালনায় নিম্ন পদ থেকে উচ্চতম দপ্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যথাযোগ্য প্রতিপত্তি থাকবে। আমি চাই যে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ উৎপাদনকারী-সমবায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে, এবং সেই সমবায় সমূহই শিল্পের মালিক হবে এবং সেই সমস্ত শিল্প পরিচালনা করবে। সমবায় পরিচালনার নিয়ম প্রণালী ব্যতীত রাষ্ট্র সমবায়ের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করবে না। এই সমস্ত শিল্পের সাথে কৃষি-সহকারী-শিল্প এবং অধুনা প্রচলিত ও নতুন-উদ্ভাবিত হস্তশিল্প এবং অপরাপর ছোটখাট শিল্পও থাকবে।

আমি আরও একপ্রকার শিল্প মালিকানা এবং 'উৎপাদনকারী সমবায়' প্রবর্তন করতে চাই। সেটা হল, পৌর বা সামাজিক মালিকানা। পৌরসভা

বা নগরগুলি বড় শিল্প না হলেও ছোটখাট এবং মাঝারি শিল্পসমূহের মালিক হতে পারে এবং তাদের পরিচালনা করতে পারে। এই সমস্ত সমাজ-সত্ত্ব-বিশিষ্ট শিল্পসমূহের পরিচালনায় স্বভাবতই শ্রমিক প্রতিনিধিদের যথাযথ প্রতিপত্তি থাকবে।

আমাদের দেশের বেকার জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা সহজ নয়। আমার মনে হয় না যে সমাজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের জীবিকার সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হবে। তার উপর কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে সেই বেকার সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে আরও শতকরা বিশভাগ বেড়ে যাবে। প্রথমতঃ, এদের জীবিকা সংস্থানের উদ্দেশ্যেই আমি এই সমস্ত সমবায় ও সমাজ-সত্ত্ব-বিশিষ্ট শিল্প প্রবর্তন করতে চাই। দ্বিতীয়তঃ, আমি চাই না যে রাষ্ট্র-শক্তি শিল্প ও জীবিকার একচেটিয়া অধীশ্বর হয়ে উঠুক। সমাজবাদী সমাজে রাষ্ট্রশক্তি অবলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে রাশিয়ার ন্যায় সর্ব-শক্তি সম্পন্ন ও প্রজাপীড়ক হয়ে উঠতে পারে এবং জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার উপর অনড় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এর ফলে আমাদের দেশেও আধুনিক রাশিয়ার মত একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনাকে বিকেন্দ্রীভূত করে এবং গ্রাম সমূহকে গনতান্ত্রিক গ্রাম্য-প্রজাতন্ত্রে রূপায়িত করে এই অনড় আধিপত্য ও একনায়কত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

বাণিজ্য

বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমার অভিমত হল :

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীন থাকবে।

আভ্যন্তরিক বাণিজ্য—রাষ্ট্র, স্থানীয় সমাজ এবং সমবায়সমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে। সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে।

তারপর, এইখানেই সমাজতন্ত্রী-ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত-পরিচালিত সমবায়ী কৃষি-ব্যবস্থা। নতুন-আবাদি জমি সমূহে সামগ্রিক-পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা।

বৃহৎ শিল্প সমূহের রাষ্ট্র-মালিকানা ও পরিচালনা।

সমাজ-সত্ত্ব-বিশিষ্ট ও সমাজ-পরিচালিত শিল্প, উৎপাদনকারী-সমবায়-পরিচালিত ক্ষুদ্র-শিল্প।

রাষ্ট্র

এখন আমরা সমাজবাদী চিত্রের রাজনৈতিক অংশ নিয়ে আলোচনা করব। সমাজতন্ত্রী ভারতে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র ব্যতীত সমাজবাদ অসম্ভব। বর্তমানে একটি সাধারণ ভ্রান্তি প্রচলিত আছে যে, সমাজবাদী রাষ্ট্রে সর্বহারা একনায়কত্ব অবশ্যম্ভাবী। এ ধারণা মার্কসবাদ বিরোধী। কেবলমাত্র ধনবাদ থেকে সমাজবাদে রূপান্তরের পথে সমাজে এই একনায়কত্ব থাকতে পারে, এবং সেই একনায়কত্বও সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য্য নয়। মার্কস ইংলণ্ডের মত ধনবাদী রাষ্ট্র, যেখানে রাজনৈতিক গণতন্ত্র পরিপূর্ণ ছিল, এবং বৃহৎ ও স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব মনে করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণতঃ সমাজবাদের পথে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা মার্কসবাদী চিন্তাধারার একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু রূপান্তরের পর সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মার্কসবাদের মূল কথা। যখন পুরানো শাসক-শ্রেণীর অবসান হয়ে যাবে, এবং সমাজ সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-সঙ্ঘ হয়ে উঠবে, তখনও সর্বহারা একনায়কত্বের কথা বলা নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ, সর্বহারা শ্রেণী তখন নিজের উপর নিজে খবরদারী করবে না।

এখানে সর্বহারা একনায়কত্ব সম্বন্ধে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা থেকে সমাজবাদে রূপান্তরিত হবার সময় ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বা একনায়কত্ব যাই গ্রহণ করুক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা গণতান্ত্রিক পথই গ্রহণ করবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে মার্কসবাদে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে বর্তমান রাশিয়ার ন্যায় একদলীয় একনায়কত্ব বোঝায় না, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীরই একনায়কত্ব বোঝায়। ভারতবর্ষ ও জার-শাসিত রাশিয়ার মত শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহে কিন্তু এই একনায়কত্ব শ্রমজীবী জনসাধারণ, যথা : শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী-সমূহের সম্মিলিত একনায়কত্ব বোঝায়। এই সমস্ত শ্রেণীর এক বা একাধিক পার্টি থাকতে পারে এবং পার্টিগুলি সমবেতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে অংশ গ্রহণ করতে পারে, বা একনায়কত্বের অধীনে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে। সর্বহারা একনায়কত্ব বলতে একথা কখনও বোঝায় না যে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান বা অপরাপর শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চলবে। সর্বহারা একনায়কত্বের তাৎপর্য্য হল,

পরভোজী শাসক-শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং শাসক-গোষ্ঠীর সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া।

সমাজবাদী সমাজে গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, একদলীয় একনায়কত্ব সমাজবাদে চলবে না এবং শ্রমজীবী জনসমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে। শ্রমিক, শিল্প ও চাষী-সমবায় সমূহ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কার্য্যাবলী পরিচালনার করার অধিকার থাকবে। তারা বাধাহীনভাবে আপন আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে মনোমত রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়ন স্থানীয় সমাজ ও সমবায় সমূহ, শ্রমজীবী জনসমাজ ও অপরাপর যৌথ-প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সংবাদপত্র ও বেতার বিভাগ থাকতে পারবে, এবং তারা নিজেরা নিজেদের বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতে পারবে।

সমাজবাদী সমাজে গণতন্ত্র বলতে আমরা আরও মনে করি যে এখানে ট্রেড ইউনিযনসমূহ রাষ্ট্রের লেজুর হয়ে থাকবে না। এখানে তারা রাষ্ট্র-সমর্থক স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবেই থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে সমাজতন্ত্রী সরকারের বিরোধিতাও করতে পারবে। রাশিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কোন স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্র যখন শ্রমিকদের, সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে হবে, এই মতবাদের ভিত্তি করে রাশিয়ায় সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়েছে। একটা বিশেষ রাষ্ট্র শ্রমিকদের হতে পারে, কিন্তু সেই রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী কাজও করতে পারে। এই অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মত শ্রমিকদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন, এবং সমাজবাদী সমাজে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের গুরুত্ব অনেক বেশী, একমাত্র সরকারের পরই তার স্থান থাকবে যাতে করে প্রয়োজন-বোধে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত, সংশোধিত বা পরিবর্তিত করতে পারে।

সুতরাং আমার সমাজবাদী ভারতের চিত্র হল : অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক গণতন্ত্রের চিত্র। এই গণতন্ত্রে মানুষ ধনতন্ত্র, দল বা রাষ্ট্র কারও

ক্রীতদাস হয়ে থাকবে না, মানুষ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে সমাজ তাকে কাজ ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবে, সেই সমাজকে তার সেবা করতে হবে। কিন্তু সেই সমাজ-পরিধির মধ্যে সে তার-জীবিকা ও আশ্রয় বেছে নিতে পারবে। সে তার মতামত বাধাহীনভাবে ব্যক্ত করতে পারবে, এবং তার নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সমাজবাদী সমাজে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থাকবে। শারীরিক ও মানসিক সম্পদের ব্যবধান ব্যতীত মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে না। কারণ, সমাজবাদী সমাজে আয়ের বৃহৎ কোন ব্যবধান থাকা চলবে না।

কিন্তু রাতারাতি এই সমাজবাদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজবাদ থেকে আজও আমরা বহু দূরে। সুতরাং এই সমাজ থেকে সেই আদর্শ সমাজে পৌছাতে হলে, ছোট হোক, বড় হোক—একটা রূপান্তর-ক্ষণ থাকবেই।

শ্রেণীসংগ্রাম

যে শক্তিবলে আমরা সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাব, শ্রেণীসংগ্রাম থেকেই তার উৎপত্তি। কেবল সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীগণ ন্যায়, যুক্তি বা বুঝিয়ে সমাজবাদ আনতে পারে না। সমাজবাদের পথে সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের অবদান গুরুত্বপুর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীরা সমাজবাদের মূলশক্তি নয়। শ্রমিক শ্রেণী এবং ধনবাদী সমাজের উৎপীড়িত অপরাপর জঙ্গী শ্রেণীসমূহই শক্তির উৎস। এই সমস্ত শ্রেণীই আপন উন্নতির জন্য শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং সেই সংগ্রামই শেষ পর্য্যন্ত শোষণ-মূলক সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে শোষণ-মুক্ত সমাজ বা সমাজবাদী সমাজ সৃষ্টি করে। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে আপন সত্তা বিলিয়ে দেয়, তারাই সমাজবাদী সংগ্রামের আদর্শগত রূপ পরিস্ফুট করে তোলে এবং সেই সংগ্রামের গতিধারাকে তীব্র করে তুলতে পারে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, সমাজবাদের পথে শ্রেণী সংগ্রামই তার প্রাণশক্তি হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক গতিধারা হিসাবে সমাজবাদের সাথে দুইটি অধ্যায় জড়িত। প্রথমটি হল, যখন শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করবে, এবং দ্বিতীয় অধ্যায় হল, যখন সমাজতন্ত্রীরা শাসন-ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে সমাজবাদী সমাজ গড়ে তুলবে।

মতবাদের দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা সশস্ত্র বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, অবস্থা বিশেষে উভয় পন্থাতেই অধিকার করা চলে। এই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার জন্ম উভয় পন্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সশস্ত্র বিপ্লব

সশস্ত্র-বিপ্লব সন্ত্রাসবাদ বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সশস্ত্র ষড়যন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যখন মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ও বিত্তবান শ্রেণী জনমত উপেক্ষা করে গায়ের জোরে জনসাধারণের উপর শাসনভার চাপিয়ে দেয়, তখন সশস্ত্র বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। একথা বিশেষ করে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র-বিরোধী যে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সশস্ত্র বিপ্লব বা বিপ্লবের প্রস্তুতি বলা চলে না। সশস্ত্র বিপ্লব হল জনগণেরই সশস্ত্র অভ্যুত্থান, মুষ্টিমেয় চক্রান্ত-কারীর বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক প্রচেষ্টা নয়। একমাত্র জনসাধারণের সমর্থনে, অন্ততপক্ষে তাদের সচেতন অংশের সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারাই সশস্ত্র বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ জনসাধারণ যদি বিপ্লবে অংশ গ্রহণ না করে, তাকে সশস্ত্র বিপ্লব বলা চলে না। বড় জোর, একে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর সন্ত্রাসবাদ বলা যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্ম বোমা নিক্ষেপ বা অনুরূপ কোন নরহত্যা, লুঠতরাজ বা অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন নেই। এর জন্ম প্রয়োজন মেহনতী জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলা। এই জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলার কলা-কৌশলের মধ্যেই সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতির মূল কথা নিহিত।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

অনুরূপভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলতে কেবল নিয়মতন্ত্র বা পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি বলে যেন ভুল করা না হয়। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি যদিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি উভয়ের কার্যধারা ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র। আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ এবং কোন কোন সময়ে ধর্মঘটও নিয়মতন্ত্র বিরোধী, কিন্তু নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। অনুরূপভাবে, বিশুদ্ধ নিয়মতন্ত্রের সাথে ট্রেড-ইউনিয়ন সমূহের মত শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা বা গঠনমূলক কাজ, যেমন: সমবায়-আন্দোলন বা শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। নিয়মতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টারী

পার্টি কেবল নির্বাচনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। গণতান্ত্রিক দলেরও নির্বাচনী ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তার কার্যধারা আরও সুদূরপ্রসারী। ট্রেড-ইউনিয়ন, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এর কাজ রয়েছে। সমবায়, গঠনমূলক কাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক ক্রিয়াকলাপও গণতান্ত্রিক দলের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল নির্বাচনে জয়লাভ করা এই গণতান্ত্রিক দলের উদ্দেশ্য নয়, বর্তমান সমাজের অন্তঃস্থলে সমাজবাদের ভিত্তি স্থাপনই এর আসল উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী সরকারের প্রচেষ্টায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র জনসমাজের, যথা: ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ পঞ্চায়েত, সমবায় ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী, এবং অপরাপর জনপ্রিয় জনসংগঠনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ প্রয়োজন।

দেশে যদি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র বজায় থাকে এবং শ্রমিক, কিষাণ ও নিম্ন মধ্যবত্তি শ্রেণীসমূহ যদি উচ্চতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয় এবং নিজেদের শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলে, কেবল তখনই রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত দেশে অনুরূপ অবস্থা নেই, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অকেজো ও অযোগ্য হয়ে উঠবে, এমন কি অবস্থা বিশেষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে।

সমাজবাদের পথে যখন প্রথম অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা যখন সমাজতন্ত্রীদের করায়ত্ত হবে, তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব, অর্থাৎ মেহনতি জনতার (ভারতবর্ষের মত দেশে শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সমূহ) একনায়কত্বে সমাজবাদী সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে। সেখানে প্রতি-বিপ্লবের কোন আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ পুরানো শাসক-শ্রেণী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করে একনায়কত্ব কায়েম করার সম্ভাবনা নেই, কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

সমাজবাদের পথে ভারতবর্ষের গতিধারা আজ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের কাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে; এবং যদিও এতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের চিত্র নিখুঁত হয়ে উঠেনি, তবুও গণতান্ত্রিক কার্যাবলী পরিচালনা করবার মত এখানে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে রয়েছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকার করা

হয়েছে, এবং নানা বিচ্যুতি সত্বেও এই নতুন শাসনতন্ত্রে সুষ্ঠুভাবে সমাজবাদী আন্দোলন বাড়িয়ে তোলার মত ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বর্তমান বাধা নিষেধ ক্ষতিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তাকে অহেতুক বাড়িয়ে দেখাবারও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া গণতন্ত্রের সম্প্রসারণও সমাজবাদী আন্দোলনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সমাজবাদী আন্দোলন যত তীব্র হয়ে উঠবে, গণতন্ত্রও তত পূর্ণতর হয়ে উঠবে। আবার অপরদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বামপন্থী অর্বাচীনতা যতই উগ্র হয়ে উঠবে, প্রতি-বিপ্লব এবং ফ্যাসীবাদের সম্ভাবনাও তত তীব্র হয়ে দেখা দেবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রী দল পরিবেশের ক্রীড়নক নয়, পরন্তু পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সোসালিষ্ট পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তাই সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয়, সমাজবাদের পথে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই একমাত্র কার্যকরী পথ ও নির্ভুল সমাজ-বাদী পন্থা। ঘটনার আবর্তে যদি কখনও দেশের বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় ঘটে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, এমনকি তখনও বর্তমানে অনুসৃত গণতান্ত্রিক নীতির ফলাফল সমাজবাদের সহায়ক হয়ে উঠবে। কারণ, এই নীতির ফলে বর্তমানে সমাজবাদী শক্তি-সমূহ জোরদার হয়ে উঠবে,সমাজবাদী ভাবধারা জনসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে এবং ব্যাপকতর সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তাদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তুলবে, যার ফলে সেই পরিবর্তিত পরিবেশেও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা বা নতুন কার্যধারা, এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামও সহজতর হয়ে উঠবে।

গণতান্ত্রিক রূপান্তর না সর্বহারা একনায়কত্ব

সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়—অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীগণ কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকৃত হওয়ার পর, এই অধিকৃত নতুন রাষ্ট্র সমাজবাদ গড়ে তোলার হাতিয়ার হয়ে উঠে। এই অবস্থায়, রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে পারে, আবার রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপও করতে পারে। যদি সমাজবাদ দেশের বৃহত্তর মেহনতি জনতাকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে এবং তারা কায়েমী স্বার্থের প্রভাব-মুক্ত হয়ে ওঠে, তখন এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি এত ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে প্রতিবিপ্লবের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। গণতান্ত্রিক

পথেই তখন সমাজবাদী সমাজ গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু যদি এই নতুন রাষ্ট্র বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে, বা তার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, সমাজের প্রতিবিপ্লবী শক্তি সমূহকে তখন জোর করে দাবিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, তখন সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। কিন্তু এই একনায়কত্ব কিছুতেই বিশেষ কোন একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব বা তার চেয়েও জঘন্য একদলীয় একনায়কত্ব হয়ে উঠবে না। এই একনায়কত্বে সর্বহারা স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীই রাষ্ট্র-ক্ষমতার অংশীদার হতে পারবে এবং গণতন্ত্র-বিরোধী দল ব্যতীত সমস্ত সর্বহারা পার্টিগুলিই অবাধে তাদের রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করতে পারবে। কেবলমাত্র সর্বহারা-বিরোধী ব্যক্তিবর্গেরই নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজবাদের মূলশক্তি। ভারতবর্ষে শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতি মধ্যবিত্ত-শ্রেণী, কেউ আজ সংঘবদ্ধ নয়। তাদের ঐতিহাসিক অবদান—অর্থাৎ সমাজবাদের পথে তাদের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে আজও তারা সচেতন হয়ে ওঠেনি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাদের দাবী দাওয়া আজও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেনি। মেহনতি জনতার বিশাল অংশ আজও বিচার বিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও সমাজ-বিরোধী শক্তি সমূহের (যথা জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা) দ্বারা প্রভাবিত। এই সমস্ত শক্তির প্রভাব-মুক্ত হয়ে যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ তাদের সত্যিকার স্বার্থ ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে না উঠবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজবাদ সুদূর স্বপ্নই থেকে যাবে। সুতরাং আজকের সমাজবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, মেহনতি জনতার শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের শ্রেণী-চৈতন্য বাড়িয়ে তোলা, অভাব-অনটন, শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তি সংগ্রামকে তীব্র করে তোলা।

গঠনমূলক কাজ

গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষিত-শ্রেণী সমূহের সংগ্রাম, তাদের মুক্তি ও শাসন পরিচালনায় তাদের দক্ষ করে তুলতে হলে, শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে গঠনমূলক কার্যাবলীরও প্রয়োজন। শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে সর্বপ্রকার গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী সমাজবাদের অগ্রগতির

পথে সহায়ক হয়ে উঠবে। সমাজবাদের পথে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতাই হল গঠনমূলক কার্যাবলীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অপরাপর কার্যবলীর মধ্যে শ্রমিক সমাজের শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলন, যুব আন্দোলন, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা; বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনের নাম করা যায়। সেই সঙ্গে গ্রাম্য রাস্তা তৈরী, কূপ পুকুর খনন এবং বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যাবলীও যুক্ত করা যেতে পারে। সমাজবাদের পথে এই সমস্ত কার্য্যবলীর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। শ্রেণী সংগ্রামের মতই এই সমস্ত গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ আমাদেব সমাজতন্ত্রী কার্যাবলীর অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে।

মার্কসবাদ

আবার আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁর বলেন, আমাদের পদ্ধতিই ভুল। তাঁরা মনে করেন যে, রক্তপাত ও সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলার অর্থ হল, শ্রমিকদের ভাঁওতা দিয়ে বিভ্রান্ত করা। তাঁদের ধারণা, সমাজবাদের একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং সেটা হল, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। তাঁদের এই গোঁড়ামির সমর্থনে তাঁরা মার্কসের উক্তি উল্লেখ করে থাকেন। সুতরাং আমরাও এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মার্কসের উক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

১৮৭২ খৃঃ প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ সম্মেলনে সমাজবাদী পদ্ধতি সম্বন্ধে মার্কস বলেছিলেন: 'নতুন শ্রম-সমাজ গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের একদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতেই হবে, এবং পুরানো রীতিনীতির আমূল সংস্কার করতে হবে। নতুবা উদাসী খৃষ্টানদের মতই সমস্ত পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্ত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি যে সর্বত্র একই উপাযে সাধিত হবে—এ কথা আমরা বলি না। প্রত্যেক দেশের প্রতিষ্ঠান, লোকাচার ও ঐতিহ্য অনুসারে শ্রমিকদের মুক্তির উপায় স্থির করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের মত দেশে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য সাধন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব, সেকথা আমরা অস্বীকার করিনা। হল্যাণ্ডের বেলায়ও হয়তো তাই, কিন্তু সকল দেশের পক্ষে সেকথা খাটেনা।"

যদি সমালোচকরা এই উক্তিকে মার্কসের সাময়িক বিভ্রান্তি বলে উড়িয়ে না দেন, তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে মার্কসবাদ তাঁরা মোটেই উপলব্ধি

করতে পারেননি। এই সম্বন্ধে মার্কসের সত্যিকার অভিমত হল : অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় কোন পন্থা উপযুক্ত, তা সেই দেশের ঐতিহাসিক ভিত্তি, বাস্তব পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভর করবে।

একটা বিশেষ পরিবেশে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিই কার্য্যকরী হতে পারে। কিন্তু কোন্ দেশে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা সমীচীন, তা' সে দেশের পারিপার্শ্বিকের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হবে, কোনপ্রকার পূর্ব-পরিকল্পিত গোঁড়ামি বা অনড় মতবাদের দ্বারা নয়।

সমালোচকেরা এর প্রত্যুত্তরে বলে থাকেন যে, মার্কসের সমসাময়িক অবস্থা আজ বদলে গেছে; শান্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা আজ একেবারে অসম্ভব। প্রয়োজনবোধে মার্কসের সংশোধন করা ভাল। কিন্তু তারা যদি মার্কসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ না করে, তাহলে সে সংশোধন কতকগুলি মনগড়া বিকৃতি হয়ে উঠবে। হেগ সম্মেলনে যখন মার্কস এই উদ্ধৃত উক্তি করেছিলেন, সমগ্র য়ুরোপে তখন প্রতিক্রিয়াশীলতার জয়-জয়কার। এমন কি ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডেও তখন রাজনৈতিক গণতন্ত্র পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আজকে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সোভিয়েট "সাম্যবাদের" অধীনে; চীন এবং সমগ্র পূর্ব-য়ুরোপ, এবং মধ্য য়ুরোপের কিছু অংশও কমিউনিষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া এবং গ্রেট বৃটেনে সমাজতন্ত্রী সরকার এবং শক্তিশালী সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পশ্চিম য়ুরোপের অপরাপর অংশে অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র আছে। এবং গত যুদ্ধের ফলে ধনবাদও বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে, সাম্রাজ্যবাদও ভেঙ্গে পড়ছে। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল ও বর্ম্মা স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ্বের অপরাপর ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হয়ে পড়ছে। নিউ-ডিল নীতির ফলে আমেরিকা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে গেছে; সে অগ্রগতি আজও রুদ্ধ হয়ে যায়নি, এবং যুদ্ধান্তে আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অপরাপর অংশেও গণতন্ত্রী শক্তিসমূহ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং আজকের অবস্থা মার্কসের সমসাময়িক অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হলেও, সেই স্বাতন্ত্র সমাজবাদের পথে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের স্বপক্ষেই সায় দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে সমাজবাদী শক্তিসমূহ আজ বহুগুণে শক্তিশালী। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর নানা বাধা-বিপত্তি এবং ব্যক্তিবর্গকে

বিনা-বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রাজনীতি পরিচালনা করার মত প্রচুর সুযোগ সুবিধা আছে।

আমাদের দেশে যদি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হযে উঠে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর বর্তমান বিধি-নিষেধও বিলুপ্ত হযে যাবে। মার্কসবাদ অনুসরণ করতে হলে বর্তমানে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রীদের দ্বিধাহীন চিত্তে গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিতে হবে। এছাড়া, বর্তমান অবস্থায সমালোচকরা অন্য কোন কার্য্যকরী পন্থার সন্ধান দিতে পারবে কি? এ প্রশ্নের আজও কোন সুষ্ঠু জবাব পাওযা যাযনি।

কমিউনিষ্ট পদ্ধতি: রাশিয়া-চীন

কমিউনিষ্ট পার্টির একটি নিজস্ব পন্থা আছে। গণতান্ত্রিক দেশেও তারা সহিংস-পন্থা অনুসবণ করে থাকে, নবহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি-সংযোগের সহায়তা নেয়। কমিউনিষ্টদের ধারণা, এই পথেই তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক-পদ্ধতি অনুসরণ কবছে। সহিংস পন্থা অনুসরণ করে কমিউনিষ্ট পার্টির কি পরিণতি হযেছে, গত দুই বৎসরের ইতিহাসেই তার নজীর মেলে। এর ফলে কেবল কমিউনিজম্ আজ হেয় প্রতিপন্ন হযনি, কমিউনিষ্ট পার্টির বহু-প্রশংসিত সংহতি সম্বন্ধে অহেতুক মিথ্যা ধারণাও আজ কেটে গেছে। আজ কমিউনিষ্ট পার্টি শতধাবিভক্ত হযে পডেছে, পার্টির মধ্যে অন্তহীন দলাদলি ও আদর্শগত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে কেউ কমিউনিষ্ট পদ্ধতি সমর্থন করেন না। কিন্তু তা সত্বেও, কেউ কেউ, আপন কর্মসূচীর সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক পন্থার বিকল্পে শত চেষ্টা করেও তৃতীয় কোন মধ্যপন্থা আজও আবিস্কৃত হয়নি।

এখানে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করব, এবং আবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসব। কমিউনিষ্ট পার্টির নতুন নীতি (শ্রীজয়প্রকাশ এখানে রাজেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির নতুন নীতির উল্লেখ করেছেন) নিযে নানা কথাই শোনা যাচ্ছে। কমিউনিষ্টদের নিয়ত নীতি-পরিবর্তন এবং নতুন নতুন কার্যধারা সম্বন্ধে আমাদের সম্যকউপলব্ধি প্রয়োজন। রণদিভে সাবেকী রুশ কায়দায় সমাজ-বিপ্লব—অর্থাৎ জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক রাষ্ট্র গঠনের কর্মসূচী অনুসরণ করেছিলেন।

কিন্তু সেই পদ্ধতি ভারতবর্ষে ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং হয়েছেও তাই। বিপ্লবীদের খেয়াল মত সশস্ত্র বিপ্লব হয়না, কমিউনিষ্টরাও পারেনি। না-পারার এই ব্যর্থতার ফলেই রণদিভের কর্মসূচী পবিত্যাক্ত হয়েছে। কমিউনিষ্টরা এখন সাবেকী রুশীয়-পদ্ধতি পরিত্যাগ করে চৈনিক-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। পূর্বের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস-পন্থা সম্প্রতি কিছুটা হয়ত বন্ধ থাকবে। সহরে কমিউনিষ্টরা অনেকটা নরম পন্থাই অনুসরণ করবে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধার করাব চেষ্টা করবে। কিন্তু এই পদ্ধতিও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ প্রজাতন্ত্রী ভারত যে কেবল জার-তন্ত্রী রাশিয়া থেকে স্বতন্ত্র তা নয়, পঁচিশ বৎসর পূর্বের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চীন থেকেও স্বতন্ত্র।

যেই সময়ে কমিউনিষ্টরা চীন দেশের কোন কোন অংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেই সময়ে চীনের জাতীয় সরকার তৎকালীন সমর-শাসকদের সাথে মরণ-পণ সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল। এই সমর-শাসকদের মধ্যে, কেউ কেউ এমন কি বিদেশী শক্তিরও সমর্থন লাভ করেছিল। চিয়াং কাইশেক তখন মাও-সে-তুংএর ক্ষুদ্র লাল চীন থেকে চ্যাঙ্-সো-লিন্ এবং অপরাপর সমর-শাসকদের চৈনিক-প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তর শত্রু মনে করতেন। সুতরাং, তিনি যখন একে একে সমস্ত সমর-শাসকদের পরাস্ত করে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করাছিলেন, সেই অবসরেই মাও-সে-তুংএর লাল চীন শক্তি-সামর্থ্য ও আয়তনে প্রশস্ত হতে থাকে। কিন্তু চিয়াং যখন দক্ষিণ চীনে কমিউনিষ্টদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সমস্ত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রই তখন কয়েকশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরিয়ে আনা হয়। ইতিমধ্যে চিয়াং অন্যদিকে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন এবং মাও'এর লাল রাষ্ট্র চীনের সুদূর-সীমান্তে সোভিয়েট এশিয়ার পাশাপাশি ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠতে লাগল।

তারপর চীন, ধীরে ধীরে সমস্ত বিপত্তি কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলেও চীনের উপর চিয়াংএর সামরিক একনায়কত্ব অনড় হয়ে রইল। চীনে কোন-প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং শাসনতন্ত্র বা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল না।

কিন্তু চীনের সেই সমস্ত অবস্থার সাথে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কোন সাদৃশ্য নেই। ভারতবর্ষে আজ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সারা ভারতবর্ষই সেই সরকারের আদেশ মেনে চলে। ভারতে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী আছে এবং চীনের মত কোন সমর-শাসক এখানে নেই। আমাদের দেশে গণপরিষদ থেকে বিচ্যুতিহীন না

হলেও মোটামুটি ধরণের একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আমরা লাভ করেছি। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং বিরোধী দল-সমূহ (যারা খোলাখুলিভাবে হিংসাত্মক-পন্থা অনুসরণ করেনি) অবাধে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এদেশে চীনের মত লাল-অঞ্চল সৃষ্টি বা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের তার প্রভাব বিস্তারে কোন সম্ভাবনা নেই। যদি চীন জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত না হত এবং মাঞ্চুরিযার জাপানীরা রাশিযার কাছে পরাজয় স্বীকার না করত, এমন কি মাও-সে তুংও চীনে জযলাভ করতে পারত কিনা সেই বিষযে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুতরাং, সেইজন্যই আমি আবার বলতে চাই, চৈনিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য কমিউনিষ্টদের প্রতি কমিনফর্মের নতুন নির্দেশও পূর্বেকার মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দুই বৎসর পূর্বে (১৯৪৮ সালে) কমিনফর্মের নির্দেশকে ভিত্তি করেই কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা কার্যসূচী রচিত হয়েছিল।

সোস্যালিষ্ট নীতি

এবার আমরা আমাদের পূর্ব-পর্যালোচিত প্রশ্নে ফিরে আসি। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল বলে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রী দল সোস্যালিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে থাকে, তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হল, কার্যক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলে অথচ মুখে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদ অসম্ভব বলেই প্রচার করে। কিন্তু তাদের বিপ্লব মৌখিক বাগাডম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে শান্তিপূর্ণ পথের অনুসরণ এবং ভবিষ্যতে সহিংস-পন্থার অনিবার্য্য প্রয়োজন, সম্ভবতঃ এই মনোভাবই এই সমস্ত সমাজতন্ত্রী দলের দু'মুখো নীতির মূলে কাজ করছে। কিন্তু সোস্যালিষ্ট পার্টির অনুসৃত নীতি—অর্থাৎ, বর্তমান ভারতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই একমাত্র মার্কসবাদী-পন্থা। মার্কসবাদই বলে যে, দেশে যদি গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই সমাজবাদ লাভের চূড়ান্ত সংগ্রামেও একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

যদি কোন কারণে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করেও আমাদের দেশকে ফ্যাসীবাদের হাত থেকে রক্ষা

করতে না পারি, মার্কসবাদে সামান্যতম জ্ঞানও যার আছে, তিনিও অকুণ্ঠচিত্তে বলবেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তখন অকেজো হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রথমেই নিরাশ হবার বা সংগ্রামের পূর্বেই পরাজয় স্বীকার করার কোন কারণ নেই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস দেশে যদি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ যথাযথভাবে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, কেবল তখনই ফ্যাসীবাদ রোধ করে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার নিরাপত্তা বিধান করা সহজতর হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ, এমন কি ভবিষ্যতেও যদি দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক অবস্থার কোন বিপর্য্যয় ঘটে, সেই বিপর্যস্ত অবস্থায়ও সমাজবাদের জন্য সংগ্রাম করতে হলে, সেই বিপর্য্যয়ের অনুকূলে অপেক্ষা না করে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এখন থেকেই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। যদি বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সোস্যালিষ্ট পার্টি দেশের জনসমাজের সমর্থন লাভ করতে পারে এবং তাদের রাজনৈতিক চৈতন্য ও সংঘশক্তিকে জোরদার করে তুলতে পারে, কেবল তখনই গণতন্ত্রের বিপর্যায়ে সোস্যালিষ্ট পার্টির সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান কার্য্যকরী হতে পারে।

জনসাধারণের মধ্যে এই রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে যে, যখনই শাসক-শক্তি গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে চাইবে, তখনই দেশের জনসমাজকে সশস্ত্র গণ-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্যদের সাথে আলোচনা করে সময় সময় তাঁদের মধ্যে এমন একটি মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, যেন সমাজবাদের পথে সহিংস-পন্থাই সত্বর ফলপ্রসূ হয়ে উঠে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কাল-সাপেক্ষ অলস ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মতই দীর্ঘসূত্রতাদুষ্ট। কিন্তু এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই। সহিংস পথে সফলতা যে কত দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ রাশিয়াই তার দৃষ্টান্ত। প্রথম মহাযুদ্ধ না হলে, বলশেভিক বিদ্রোহ দেখা দিত কি-না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমানে সহিংস বিপ্লবের সফলতা সম্বন্ধে অনেকে চীনের কথা বলে থাকেন। কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান যে, আজ অন্ততপক্ষে ২৪ বৎসর ধরে চীনে সশস্ত্র সংগ্রাম চলে আসছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছাড়া চীনে মাও-সে-তুং-এর জয়ও সুনিশ্চিত হত না।

সুতরাং সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু কিভাবে আমরা সেই পথে এগিয়ে যাব?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে একটা সম্ভবপর ভ্রান্তি সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ যেমন মনে করেন, সর্ব অবস্থাতেই সশস্ত্র পদ্ধতি ছাড়া পথ নেই, তেমনি আবার অনেকে আছেন, অবস্থা যাই হোক না কেন, সশস্ত্র-পন্থা বেছে নিতে নারাজ। উভয়ের সাথেই সোস্যালিষ্ট পার্টির মূলগত পার্থক্য আছে। সোস্যালিষ্ট পার্টিতে তাদের স্থান নেই।

পূর্ব বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সোস্যালিষ্ট পার্টির মূলনীতি নির্দ্ধারক ঘোষণায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে নিয়মতন্ত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখানো হয়েছে। সোস্যালিষ্ট পার্টি নিছক একটা পার্লামেণ্টারী পার্টি নয়। প্রকৃতপক্ষে সোস্যালিষ্ট পার্টি আজ পার্লমেণ্টেই নেই। সোস্যালিষ্ট পার্টি একটি বিপ্লবী পার্টি। প্রয়োজনে যদি পার্লমেণ্টকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু এর সফলতার প্রধান উৎস পার্লামেণ্টের বাইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে।

যদিও নির্বাচনে জযলাভ কবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই অঙ্গ, সোস্যালিষ্ট পার্টির বিশ্বাস, শাসন ক্ষমতা অধিকার করার পবও সমাজবাদী রাষ্ট্রের সহায়তা এবং পরিচালনা সত্ত্বেও জনসমাজকে আপন শক্তিবলেই সমাজ-বিপ্লবের পথে আরও এগিযে যেতে হবে।

পূর্বেও বলেছি, পার্লামেণ্টারী পার্টি নির্বাচন-যন্ত্র ছাডা কিছু নয় এবং প্রচারই এর প্রধান সম্বল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দল কেবল একটা নির্বাচনী যন্ত্র নয, কেবল প্রচারের উপর এর ভিত্তি নয। সোস্যালিষ্ট পার্টি ট্রেড-ইউনিযন, কিষাণ-পঞ্চায়েৎ এবং যুব-সংঘ ইত্যাদি গডে তোলে এবং জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম করে থাকে। স্থানীয সংগ্রাম, ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনা করাও সোস্যালিষ্ট পার্টির কাজ। প্রয়োজন বে ধে সোস্যালিষ্ট পার্টি ব্যাপক জাতীয় সংগ্রামের আহ্বানও জানাতে পারে। সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনমূলক কাজও করে এবং সমবায, রাস্তা তৈরী, বাঁধ বাঁধা ও পুকুর খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকদের শিক্ষাবিষযক এবং অপরাপর কার্য্যাবলীও সোস্যালিষ্ট পার্টির কার্য্যধারার মধ্যে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলতে সোস্যালিষ্ট পার্টি জন সংগঠন, প্রচার, আন্দোলন, সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজই বোঝায় এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যালিষ্ট পার্টি আজ এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বস্তুতঃ সোস্যালিষ্ট পার্টি এই গণতান্ত্রিক পথেই এগিয়ে চলেছে।

চার ঃ গণ আন্দোলন

বরট্রাম উলফ তাঁর 'ক্রুশ্চেভ এ্যাণ্ড স্টালিনস্ ঘোষ্ট' গ্রন্থে জারের রাজত্ব সম্পর্কে ক্লিচেভ্স্কী নামে একজন ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: 'রাষ্ট্রক্ষমতা ফুল-পল্লবিত হতে থাকে, আর জনগণ শুকিয়ে যায়।

গণতন্ত্রের দুই শক্তি

কিন্তু দুঃখের কথা, আজকের গণতন্ত্রেও আমাদের এই ধরণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। মার্কস এবং গান্ধীর দর্শনে অন্তিমে এক সমাজমুক্ত সমাজের কল্পনা আছে। কিন্তু আমি জানি না, রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে ঝরে যাবার অবস্থায় কখনও আসবে কি না, আর যদি আসে তবে কবে আসবে? আজ তো দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রসত্তার উপরেই সকলে অবলম্বন করে আছেন। রাষ্ট্রের অধিকার এবং কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। জনগণের কল্যাণের নামে রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষমতা নিজের হাতে রাখছে এবং জনজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাড়ছে। রাষ্ট্রের উপর জনগণের নির্ভর ত বেড়েই চলেছে।

তাছাড়া, এ-ও দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র বিভিন্ন শক্তির স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্য ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। এমন অভিজ্ঞতাও হচ্ছে যে নৈতিক কারণে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করলে এর মোকাবিলায় রাষ্ট্র প্রচণ্ড দমন পীড়ন শুরু করে দেয়। গণতন্ত্রের দুটি শক্তি—এক দিকে সরকার বা রাষ্ট্রের শক্তি এবং অন্যদিকে জনগণের শক্তি বা লোকশক্তি। দুটি শক্তিই যখন তাল মিলিয়ে চলতে থাকে তখন গাড়ীও এগিয়ে যায়। ঠিক দুটি হাতের মতো, দুটি হাতের মিলন হলে তবেই তালি বাজবে, তা না হলে তালি বাজতে পারে না। কিন্তু কখন কখন এমন অবস্থাও আসে যখন লোকশক্তি এবং রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় সাধারণত দেখা যায় যে যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তাঁরা মনে করেন যে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখতে হবে, তাদের শাসন করতে হবে। আর যেহেতু তাঁরা শাসক সেইহেতু জনতার উচিত তাঁদের আদেশ চুপচাপ পালন করে যাওয়া। এইভাবে প্রায়ই গণতন্ত্রে জনগণ এবং সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।'

লোকশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি

এমনও হতে পারে যে জনগণের কোন প্রতিনিধি অথবা জনগণের প্রতিনিধিমূলক কোন সরকার তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না, সরকার স্বয়ং দুর্নীতিগ্রস্ত, দমনকারী এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় জনগণের কী করা উচিত? সরকারের দুর্নীতি ও অন্যায় কাজকর্মের বিরুদ্ধে লোকে কী করবে? তারা কি পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করবে? আর এই নির্বাচনও যখন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না তখনই বা তারা কী করবে? আপনারা যদি এই রকম সরকারের মুখোশ খুলে না দিতে পারেন, তাকে সরাতে অথবা তার পরিবর্তনের জন্য কোন আন্দোলন করতে না পারেন, তবে রাষ্ট্রের হাত থেকে জন-জীবনের উদ্ধারের আর কী সাধন হতে পারে!

আসল কথা হোল সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, বন্ধ, আইন অমান্য সব কিছুই গণতন্ত্রের হাতিয়ার। প্রয়োজনেও এগুলির প্রয়োগ যদি না হয় তবে সে-গুলিতে মরচে পড়ে যাবে। এই জন্যই যথোপযুক্ত সময়ে কাজে নেমে পড়ার কয়েকটি সাধন জনগণের কাছে থাকা উচিত।প্রকৃতপক্ষে যখন সংবিধান সম্মত পদ্ধতিগুলি এবং তার দ্বারা অনুমোদিত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি জনগণের বেদনা দূর করতে অথবা তাদের সদ্ ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন লোকেরা আর কী করতে পারে? এমন অবস্থায় গণতন্ত্রের সুস্থ এবং আকাঙ্খিত লক্ষ্য হল, গণতন্ত্রের আধার শক্তি জনগণ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং সংবিধান বহির্ভূত হলেও শান্তিপূর্ণ পথে রাষ্ট্রকে অবনত করে নিজেদের। অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সংসদীয় গণতন্ত্রেও মানুষ শুধু ভোর নিষ্ক্রিয় বাহক না থেকে সক্রিয়ভাবে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইবে এবং অন্তত তাঁদের গতিবিধির উপর খবরদারি করবার জন্য প্রকৃত 'ডেমাস' বা 'গণ' রূপে কাজ করবে। এর মূল কথা হোল, গণতন্ত্রে লোকশক্তি রাষ্ট্র শক্তির ওপরে এবং রাষ্ট্রশক্তি লোকশক্তির অধীন। প্রয়োজন হলে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং আন্দোলন চালাবার অধিকার জনগণের আছে।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে এবং সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে। *গণতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসার কোন স্থান নেই*

গণ-আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত হবে। শান্তিপূর্ণ কথাটির সঙ্গে আমি 'শুদ্ধ' কথাটিও জুড়তে চাই। শান্তিপূর্ণ এবং শুদ্ধ পদ্ধতির শক্তি অপরাজেয়। দেশের ছাত্ররা এবং অন্য আন্দোলনকারীরা কখন কখন বাসে ও জনসাধারণের সম্পত্তিতে আগুণ লাগিয়েছেন, ভাঙ্গচুর করেছেন এবং জনতাকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করেছেন। কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই ধরণের ভুল কাজের সমর্থন করতে পারেন না। কোন আন্দোলনেই কোন ব্যক্তি নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে নিজের খুশীমতো ব্যবহার করতে পারে না। নির্দিষ্ট আইনভঙ্গও করতে হবে সুশৃঙ্খলভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে। আন্দোলনে যোগদানকারী কোন ব্যক্তিই খুশীমতো আইনকে নিজের হাতে নিতে পারেন না।

সরকারের হিংসা

সরকার পক্ষকেও চিন্তা করতে হবে। সরকার সমাজে হিংসা কমাতে চাইলে কয়েকটি কথা তাকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। সর্বপ্রথমে বিভিন্ন প্রকার হিংসার মধ্যে যে পার্থক্য তা চিনে নেবার অভ্যাস তাকে করতে হবে। একটি হোল খুবই সুশৃঙ্খলভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে কৃত হিংসা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বিহার আন্দোলনের সময় পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রিকার বাড়িতে যে হিংসা সংঘটিত হয়েছিল তার অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় হোল, গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা কৃত হিংসা। তৃতীয় হোল, ছোট ছোট হিংসা যেখানে লোকেরা ইট পাথর ছোঁড়ে অথবা এদিকে ওদিকে বাস ইত্যাদি জ্বালিয়ে দেয়। এই হিংসা হয় রাগের মাথায় করা হয়, নয়তো বদলা নেবার ইচ্ছায় করা হয় অথবা না ভেবে-চিন্তে কেবল রুগড়াটে মেজাজের জন্য করা হয়। সরকার ভাবনা চিন্তা করে এই সব হিংসা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন এমন মনে হয় না। তার ফলে যারা আসলে অপরাধী তারা ধরা পড়ে না, অন্যদের এমন কি যাঁরা একেবারেই নির্দোষ তাঁদের শাস্তি পেতে হয়।

দ্বিতীয় কথা, সরকারের ও বোঝা উচিত কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে লোকেদের মনে হিংসা জাগ্রত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছে। লোকেদের অসন্তোষ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর জন্য কখন কখন সেই অসন্তোষ ফেটে পড়ে।

সরকারকে একথাও মনে রাখতে হবে যে শ্রীরামলুর আমরণ অনশনের পর

যখন স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হোল তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে পরম্পরা চলে আসছে তা হোল, সরকার শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কাজকর্মের প্রতি মোটেই মন দেন না—সেই কাজকর্ম যতই শান্তিপূর্ণ এবং শুদ্ধ হোক না কেন। কোন বিষয়ে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এসব একটি ঘটনাও তো মনে পড়ে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তো জনসাধারণের আবেদনগুলির উত্তরও দেওয়া হয় না। অথবা কোন অজুহাত সৃষ্টি করা হয় কিংবা মূল বিষযটি এড়িয়ে অস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়। কিন্তু যখন জনসাধারণের সম্পত্তির ভাঙ্গচুর করা হয অথবা জ্বালিযে দেওয়া হয় কিংবা কিছু ধ্বংস করা হয় তখন সরকার তৎক্ষণাৎ সেদিকে দৃষ্টি দেন এবং দমন পীড়ন শুরু করে দেন। কিছু শ্রদ্ধেয মানুষও আমাকে বলেছেন যে সরকার তো হিংসা না করলে কিছু শোনেই না। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে যতদিন সরকারের এই চালচলন বদলাচ্ছে ততদিন হিংসাকে আটকান যাবে না।

এরই সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে তার নিজস্ব হিংসাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিখতে হবে। এতদিন যে ধারা চলে আসছে তা হোল, কোথাও যদি ইট-পাথর ছোঁড়া হয অথবা কোন পুলিস অফিসারের গাযে ইটের আঘাত লাগে, তাহলে বন্দুকের নল থেকে গুলি বেরুতে থাকে। তার ফলে কিছু লোক আহত হয় এবং আশে-পাশে দাঁড়িযে থাকা মানুষদের মধ্যে কেউ নিহত হয়। এ রকম প্রায়ই হযে থাকে। সমাজ সরকারের হাতে যে দণ্ড-শক্তি দিযেছে এইভাবে বিবেচনাহীন ভাবে তার ব্যবহার বন্ধ হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান শ্রীরুস্তমজী আভ্যন্তরীণ আইন ও ব্যবস্থার রক্ষার জন্য কম বিধ্বংসী উপকরণ ব্যবহারের যে সুপারিশ করেছেন সরকারের উচিত এখনই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। রুস্তমজী বলেছেন যে রাইফেল তো লড়াই করার জন্য, তার ব্যবহার দেশের মানুষের উপর করা যায় না। আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য নতুন ধরণের এমন গুলি দরকার যা মানুষকে আঘাত করবে, প্রাণে মারবে না।

আবার সরকারকে তার নিজের ঘরও সামলাতে হবে। ঘুষখোর, উৎকোচভোগী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ মন্ত্রী এবং অফিসারদের তাড়িয়ে দিতে হবে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে, কালোবাজারীদের, মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, অনাহারে আর্তগরীব মানুষদের কাছে সাহায্য পৌঁছানর ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি নিতে

হবে, প্রত্যেকের কথা শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে শুনে তাকে কোন ভাবে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে।

ছাত্র হিংসা কেন?

এ প্রশ্নে আমাদের গভীরে যেতে হবে। আমাদের এই অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাসে আগুন লাগাতে বা অন্ত হিংসাত্মক কাজ করতে যায় কেন? আর তাদের এই ভুল কাজ করা থেকে নিরত করতে আমরা কী করেছি? তার জন্য আমাদের ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে। এই ধরণের ব্যবহারের জন্য তাদের উসকে দেবার, উত্তেজিত করার কারণ কী? এমন হতে পারে যে কিছু তথাকথিত ছাত্রনেতা নিজেরা অপরাধপ্রবণ হওয়ায়, যেসব গুণ্ডা ও উপদ্রবকারীদের সঙ্গে ছাত্রজগতের কোন সম্পর্ক নেই তাদের নিজেদের সঙ্গে রেখে এই জাতীয় কু-কীর্তি করে। কিন্তু ছাত্র-জগতের অসন্তোষের যে সমস্যা তাকে অপরাধ প্রবৃত্তির এই কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর মূলে রয়েছে আমাদের অসম ও এক ধরণের গলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষিতদের বেকার থাকার ফলে তাদেব মধ্যে সৃষ্ট নিবাশা এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐ সব নীতি উল্টো রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। এই সবের মূলে যে মৌলিক সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের পথ খোঁজার জন্য আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

ছাত্র-জগতের অসন্তোষ নিয়ে যত অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে তার বিবরণ আমাদের এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তবে আজ পর্যন্ত যে সব উত্তর পাওয়া গিয়েছে তাকে অবলম্বন করে নতুন নীতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই নীতিকে কার্যান্বিত করার সাহস আজ কার আছে? কেননা সেই নীতি কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উপযোগী নীতি হবে না, তার মধ্যে অন্য কয়েকটি বিষয়কেও যুক্ত করে নিতে হবে। যেমন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য, সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের পুনর্গঠন প্রভৃতি। আমার ভয়, আমাদের সমাজের মধ্যবিত্তরা—যাঁরা রাজকাজের সঙ্গে যুক্ত, প্রশাসনে অধিষ্ঠিত অধিকারীবর্গ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অন্য পেশায় নিযুক্ত লোকেরা সব সময়েই কোন না কোন অজুহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজ-

নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের কাজে বাধা হয়ে থাকেন।

আইন অমান্য, না সত্যাগ্রহ

আন্দোলনের প্রসঙ্গে আইন অমান্যের প্রশ্নটিও বিচার করতে হবে। সাধারণতঃ আন্দোলনে আইন অমান্যের সমাবেশ ঘটে না। কিন্তু অ-সাধারণ অবস্থায় যখন সরকার দুর্নীতি প্রভৃতি আপন অন্যায়গুলিকে জিদ করে সমর্থন করতে থাকেন এবং তৎকালিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনগুলির ক্ষেত্রে জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে দমনমূলক কাজের মাধ্যমে ধ্বংস করতে চায় (যেমন বিহারের ছাত্র আন্দোলনের সময় হয়েছিল) তখন সেই অবস্থায় আইন অমান্য করা কর্তব্যরূপে পরিগণিত হতে পারে।

তাছাড়া যেসব ক্ষেত্রে আইন অমান্যের অস্ত্র কার্যকরীভাবে প্রযোগ করা যায় না, সেখানে সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজনও হতে পারে। যেমন অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধিতা। যদি এই রকম ক্ষেত্রে সরকার শোষকদের পক্ষ নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তবে সত্যাগ্রহ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের স্বরূপ নিতে পারে। দেশের কযেকটি অংশে কয়েকবার এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন হোল, নির্বাচিত কোন সবকারকে অথবা বিধান সভাকে ভাঙ্গবার জন্য আইন অমান্য কবা যেতে পারে কি না? এই বিষয়ে সংবিধানেব বিশেষজ্ঞরা এবং আইন-বেত্তারা সংবিধানের দৃষ্টিতে এই বিষয়ের ঔচিত্য সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বিধানসভাকে ভেঙ্গে ফেলবার দাবি সংবিধান-বিরোধী নয। তাকে যদি সংবিধান বহির্ভূত মনে করা হয় তবু তাকে গণতন্ত্র-বিবোধী মনে করে যায় না। অবশ্য এ কথা এখানে বলে দেওযা দরকার যে নির্বাচিত সরকারকে অথবা বিধানসভাকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য আইন অমান্যের প্রয়োগ সাধারণভাবে করা উচিত নয়। কেবল অ-সাধারণ পরিস্থিতিতেই এই পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। আর আইন অমান্য বা সবিনয় অবজ্ঞার কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হওয়া উচিত।

আন্দোলনকে সব সময় শান্তিপূর্ণ রাখতেই হবে। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন লোকেদের উত্তেজিত হয়ে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। কেননা তা করলে আন্দোলনের ক্ষতি হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যতই দমন

করা হোক না কেন তবু আন্দোলনকে প্রত্যেকটি স্তরে শান্তিপূর্ণ রাখতে হবে। টিয়ার গ্যাস, লাঠি, গুলি—এই সবের মোকাবিলাতেও আন্দোলনকারীদের সর্বদা শান্ত থাকতে হবে। বিহার আন্দোলনের ধ্বনি 'হামলা যতই হতে থাক, হাত আমাদের উঠবে না, উঠবে না' আমাদের প্রত্যেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শান্তিমন্ত্র হবে।

রাজনৈতিক দল

অনুরূপভাবে এই সব আন্দোলনকে রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুলে পারিণত করা চলবে না। এই জাতীয় গণ-আন্দোলনকে কোনও রাজনৈতিক দল বা দলসমষ্টির নেতৃত্বে পরিচালিত করা ঠিক নয়। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সব লোকেরই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের ব্যবহারও সেই রকম হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলের লোকেরা এই রকম আন্দোলনে যুক্ত হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভূমিকা দলীয় হবে না। রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিতে লোক শক্তির চেয়ে দলীয় শক্তিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মান্য করা হয়। তাদেব স্বভাব হোল, দলের স্বার্থে দলীয়ভাবে আন্দোলন থেকে ফায়দা লুটতে পুরোপুরি চেষ্টা করা। তাই এই রকম গণ-আন্দোলনে দল যদি যুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের আন্দোলনের স্বার্থের কাছে দলের স্বার্থকে গৌণ বলে মনে করতে হবে। যদি আন্দোলনে প্রভাবশালী নির্দলীয় নেতৃত্ব দাঁড় করান যায়, পর্যাপ্ত লোক-জাগৃতি হয়, লোক শক্তি সৃষ্টি হয়, তবে আন্দোলনের নির্দলীয় স্বরূপ উপস্থাপিত করা সম্ভব।

আন্দোলনের সৃজনীশক্তি

এখানে আর একটি কথা আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কোন বড় আন্দোলনের পরিবেশও আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড় করতে পারি না। সব আন্দোলনেরই পৃষ্ঠভূমিরূপে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কুশিক্ষা প্রভৃতি তত্বগুলি সব সময় সমাজে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাকে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে শুকনো ইন্ধনের মতো পরিস্থিতিতে চৈতন্য আনবার জন্য দুই একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হয়।

হনুমানের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে সে যেমন শান্ত ছিল তেমনি শক্তিশালীও ছিল। জনগণ হনুমানেরই মতো। তাদের মধ্যে অসীম শক্তি রয়েছে। প্রশ্ন হোল, তাকে আন্দোলিত করা, সংগঠিত করা এবং গতিশীল করা। ইতিহাসে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সমাজ মরার মতো

ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে আড়মোড়া ভেঙ্গে সিংহাসন বদলে দিয়েছে, সরকার বদল করেছে, প্রণালীর মধ্যে পরিবর্তন এনে সমগ্র সমাজেই ঘটিয়েছে। লোকেরা নিজেরাই এই সব করে। পরিস্থিতিই এমনভাবে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে মানুষ স্ব-ইচ্ছায় এমন গণ-আন্দোলনেব পবিবেশ তৈরী করতে পারে না। এর জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হওযা প্রযোজন। পরিস্থিতির গর্ভ থেকে আন্দোলনকে সাকার করতে হয়।

দ্বিতীয় কথা, পরিস্থিতি যখন পরিপাক হযে যায়, তখন তার গর্ভ থেকে একটি ক্রান্তিকারী আন্দোলনকে মূর্ত করার কাজ নেতার। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন আমরা বিহার আন্দোলনকে দেখি তখন দেখতে পাই যে শুরুতে যেটি কেবল ছাত্রদের আন্দোলন ছিল, তাকে জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের রূপে বদলান সম্ভব ছিল। যখন থেকে আমি বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করি তখন থেকেই আমি লোকেদেব স্পষ্ট বোঝাতে থাকি যে কেবল এক সরকার গিযে আর এক সরকার এলেই দুর্নীতি দূর হবে না, বেকারত্বও দূর হবে না এবং শিক্ষায মৌলিক পরিবর্তনও হবে না। বিগত বৎসবগুলিতে তখন ওলোট-পালোট তো অনেকই হযেছে। কিন্তু তার ফলে কী পার্থক্য হয়েছে? এজন্য এগুলির মূলে আমাদের যেতে হবে। নইলে কলুর বলদের মতো একই ব্যবস্থার চারপাশে ঘুরলে জনগণ কখনই মুক্ত হতে পারবে না। এ যেন সেই ভূত গিয়ে প্রেত আসার ব্যাপার। তফাৎ এই হবে যে নাগনাথের জায়গায় সাপনাথ এসে বসবে। এই জন্য আমি বলেছিলাম যে এখন এই আন্দোলন আর সীমিত না থেকে সমগ্র জনগণের আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। এর লক্ষ্য সম্পূর্ণ ক্রান্তি থেকে কিছু মাত্র কম হতে পারে না।

লোক-শক্তি গঠনে সত্যাগ্রহ

বিহার-আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিতে চাইতেন তাঁদের আমি বলতাম যে এতে আমাদের সত্যাগ্রহীর ভূমিকা নিযে কাজ করতে হবে। সত্যাগ্রহের একটি নিহিত শর্ত হোল এই যে সত্যাগ্রহী তাঁর নিজের ভেতরেও পরিবর্তন করবেন। তার অর্থ হোল, যিনি অপরের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চান তিনি *প্রথমে নিজের মধ্যে পরিবর্তন করে নেবেন। এর পরেই তিনি যে কোন* প্রকারের সত্যাগ্রহের দিকে অগ্রসর হতে পারেন। গান্ধীজী যেমন সত্যাগ্রহের অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে লোক-শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন, আমাদেরও এই সব

আন্দোলনে তা করতে হবে। এটি জানা কথা যে লোক-শক্তি যদি সৃষ্টি করতেই হয় তবে লোকেদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে যে যেসব সমস্যার জন্য তাঁদের জীবন আজ কণ্টকিত, সেই সব সমস্যার অবসান ঘটাবার জন্য, তার সমাধান খোঁজার জন্য কিছু কাজ করা হচ্ছে। তবেই লোকেরা আন্দোলনকে তাদের নিজস্ব বিষয় মনে করে তাতে যুক্ত হবে। তারপরে লোক-শক্তি সংগঠিত হবে।

আসল প্রশ্ন হোল, সমাজের সমগ্র অবয়বে পরিবর্তন কি করে করা হবে। যাকে আমি সম্পূর্ণ-ক্রান্তি বলি তা আরম্ভ করার পথ কী? সম্পূর্ণ-ক্রান্তির জন্য এই জাতীয় গণ-আন্দোলনের ভূমিকা কী এবং কেমন হবে? এই সব বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

ক্রান্তি ও গণ-আন্দোলন

আমার নিজের ধারণা, জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে যদি ক্রান্তিকারী পরিণাম আনতে হয় তবে তার জন্য আমাদের বিবিধ প্রকারের সাধন প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লোক শিক্ষা অর্থাৎ লোককে বোঝান সোঝানর অবস্থা থেকে চাপ সৃষ্টি করা পর্যন্ত; জনসাধারণের আন্দোলন পরিচালিত করে চাপ প্রয়োগ করে, প্রয়োজন হলে অসহযোগ করে, জনগণ বিরোধিতার পথ গ্রহণ করে এবং আইন অমান্যের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে কাজ হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি কথা হোল, এই ধরণের আন্দোলন নিরন্তর চলা চাই। কেননা যতক্ষণ না লোকেদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগ জাগ্রত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনভাবে সমাজে নব রচনা সম্ভব নয়। অবস্থা এমন সৃষ্টি করতে হবে যাতে লোকেরা তাদের নিজেদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিজেরা গড়তে পারে এবং তারা নিজেদের কাজ করবার যোগ্য হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে লোক-শক্তি কখন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে সমাজকে আন্দোলিত করলেও তা হয়েছে সাময়িক। সামান্য কিছু করেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তার প্রক্রিয়া নিরন্তর চলেনি। আমি একটি নিরন্তর ক্রান্তি দেখতে চাই। মানুষের ভেতর যা কিছু শ্রেয় তা থেকে প্রেরণা লাভ করে ক্রান্তিকারী পরিবর্তন করে যেতে হবে। তার জন্য লোক-শক্তি কেবল গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েই বিকশিত হবে না, উপরন্তু কোন না কোন সংগঠনের রূপ নিয়ে তা প্রকাশিত হবে। ক্রান্তিকারী লোক-শক্তির জন্য তার অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন রয়েছে।

পাঁচ ঃ সম্পূর্ণ ক্রান্তি

সম্পূর্ণ ক্রান্তি। নতুন সমাজ গঠনের জন্য এমন এক ক্রান্তির প্রয়োজন যা সম্পূর্ণ এবং সার্বিক হবে। তা যেন সমাজ বিন্যাসের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সর্বস্তরে স্পর্শ করে। সর্বোপরি, তা যেন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকেও আন্দোলিত করে। এই সম্পূর্ণ ক্রান্তির মধ্যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনের শক্তি থাকা উচিত।

আমি বলি সাত রকমের ক্রান্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ক্রান্তি সৃষ্টি হয়। এগুলি হোল : সামাজিক ক্রান্তি, অর্থনৈতিক ক্রান্তি, রাজনৈতিক ক্রান্তি, সাংস্কৃতিক ক্রান্তি, বৈচারিক বা বৌদ্ধিক ক্রান্তি, শিক্ষা ক্রান্তি এবং নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক ক্রান্তি। এই 'ক্রান্তি' শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন এবং নব রচনা দুই-ই নিহিত। পৃথিবীর সব কিছুই তো পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক জিনিসেরই নিরন্তর নবীকরণ হতে থাকে। এই অবস্থায় ক্রান্তিকারী পরিবর্তনের অর্থ কী? তার অভিপ্রেতই বা কী? একটি অর্থ অবশ্য এই যে ক্রান্তিকারী পরিবর্তন খুব ত্বরিৎগতিতে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, এই পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী ও মূলাভিমুখী হয়ে থাকে। কখন কখন মূল বস্তুর গুণাত্মক পরিবর্তনও হয়ে যায়। যেমন ক্রমশঃ গরম হতে হতে জল বাষ্পে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি।

মূল জীবনদর্শন

আধুনিক ভারতবর্ষের 'এলিট' শ্রেণীর অথবা ভদ্র-সমাজের চিন্তাধারা বলে যার বর্ণনা করেছি, তা সম্পূর্ণ ক্রান্তির মূল চিন্তাধারা থেকে একেবারেই আলাদা। জীবন দৃষ্টির ক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য মৌলিক। এই জীবন-দৃষ্টি বোঝাবার জন্য পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। তার কিছু আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ ক্রান্তির মূলে যে বুনিয়াদি চিন্তাধারা রয়েছে তার কিছু আভাস দিচ্ছি :

(১) **নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কলেবর :** মানুষ যেমন একটি পার্থিব অথবা স্থূল পদার্থ, তেমনি চৈতন্যও। জীবনে এই দুটির অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিত। মানুষের পার্থিব অথবা স্থূল প্রয়োজনগুলি অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় প্রভৃতির প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ হওয়া উচিত। খাদ্য পর্যাপ্ত, সাদাসিধা,

পুষ্টিকারী এবং স্বাদযুক্ত হতে হবে। কিন্তু তাতে বাহুল্য থাকবে না। বস্ত্র কেবল প্রয়োজন মেটাবার মতোই হবে না, তা দেখা এবং পরার দিক থেকে যেন রুচিশীল হয়। সকল ঋতুতে শরীরকে রক্ষা করবার দিক থেকেও তা যেন পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু এতে যেন বাহুল্য, ফ্যাসানসর্বস্বতা এবং বাজে খরচ না করা হয়। বস্ত্র তৈরীর উপাদান যথাসম্ভব প্রাকৃতিক হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব নির্জীব অথবা রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা কাপড় তৈরী করা উচিত নয়। থাকার বাড়ি হবে সাদাসিধা। মানুষের পক্ষে আরামপ্রদ, তা নির্মিত হবে স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে, আলো-বাতাসের পরিসর যেন থাকে। বড় বড় আকাশছোঁয়া এবং ত্রাসসৃষ্টিকারী অট্টালিকা নির্মাণ করা উচিত নয়। জীবন-যাত্রায় বৈভব এবং বিলাসিতাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। বৈভব এবং বিলাস শব্দ দুটি অন্য-নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষদের জীবন-ধারণের প্রয়োজনগুলির পবিপ্রেক্ষিতে তার অর্থ বোঝা দরকার।

অন্যান্য পার্থিব বস্তুর প্রযোজনগুলি সম্পর্কেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এই ধরণের সীমা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতই হতে পারে। এর অর্থ হোল, এর মূলে নৈতিকতার বিচার জাগ্রত রাখতে হবে। সাধুতার কল্পনা নিয়ে আমি এই কথা বলেছিনা। সেই পথ তো আধ্যাত্ম পথের পথিকের। আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতার জন্য সংযম ও সারল্যের কঠোর জীবন যাপনকারী সাধকদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষদের জন্য, আমার মতন সাধারণ মানুষদের কাছে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনগুলির সিদ্ধির প্রয়োজন আছে, এর মধ্যেই নিহিত থাকে আত্মার জীবন। সর্বদা লোভ, বাহুল্য, যে কোন হীন পন্থায় সম্পত্তি সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি, ধনলিপ্সা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি আত্মাকে হীন করার প্রবৃত্তি।

মানুষের জীবনের বিকাশসাধনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকরণগুলিকে পরিপূর্ণ করুন। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলি পুষ্টি লাভ করতে থাকে। পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করলেও মানুষেব মাথার উপর যে বিপদ ঘনিয়ে আছে তাকে অতিক্রম করবার কোন পথ বার করুন। কার উন্নয়ন? কিসের জন্য উন্নয়ন? কোন বিষয়ের উন্নয়ন? যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্ন? আত্মার সৌন্দর্য এবং সৃজনশীলতার প্রশ্ন? এ সব প্রশ্নেরই আলোচনা হোক।

(২) প্রাকৃতিক পরিবেশের কলেবর : গ্রাম, নগর পরগণা এবং বড়

বড় শহরের সমস্যা। একদিকে দানবীয় শহরগুলির ক্রমাগত সীমাহীন বিস্তৃতি, আর অন্যদিকে ফোঁপরা ও জরাজীর্ণ গ্রামগুলির অবস্থা। গ্রামগুলিকে আবার নতুন করে সজীব করে তুলতে হবে। ছোট ছোট গ্রামগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটে পরিণত করে সেগুলিকে সংহত করা। আদিবাসী অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, বন-জঙ্গল এবং ফাঁকা মাঠের সমস্যা নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে। শহরেরও আকার ঠিক করতে হবে। 'রেডিয়ল টাউন' অর্থাৎ আসপাশের গ্রামাঞ্চলের রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি করতে সক্ষম এমন শহরের প্রতিষ্ঠা। গ্রাম, শহর এবং নগরগুলির ভৌগোলিক বিভাগ এবং তাদের ব্যবস্থাপনা এমন হবে যাতে অনিবার্য-রূপে তাকে উপর থেকে চাপিয়ে দিতে না হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াগুলি জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করবে এবং সরকারের প্রশাসন ও জনসাধারণের সংগঠনের দ্বারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকবে।

(৩) **অর্থনৈতিক রচনা:** মানুষের সুখ এবং আরোগ্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বয়স্ক সব মানুষের কাজ পাওয়া উচিত। ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে হবে।

ভারতবর্ষে আমাদের কাছে সম্ভবত বিরাটাকার শিল্প, আধুনিকতম প্রযুক্তি (টেকনলজি) ও অধিক পুঁজি আশ্রিত শিল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে আরও বেশি উন্নতির চিন্তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হবে; তবে দেশ-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পকে বাদ দেওয়া হবে না। যা অধিক ব্যয়বহুল, যার সত্যিকারের কোন প্রয়োজন নেই শুধু মিথ্যা প্রতিষ্ঠার মোহে যা স্থাপন করা হয়েছে, অপরের অনুকরণে প্রারব্ধ অন্তরীক্ষে উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা—এর জন্য যা অপব্যয় তা বন্ধ করা দরকার। শুমেখর শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এবং টেকনলজির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে যে বিশেষ সীমারেখা অঙ্কিত করেছেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদে পৌঁছান প্রভৃতি) সে সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমি এটি চাই না যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ দুর্বল থাক অথবা পিছনের সারিতে পড়ে থাক। তবে আমার মতে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগও এমনভাবে করা উচিত যাতে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাধারণ মানুষের উপকারে প্রযুক্ত হতে পারে।

এই উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিল্পোন্নয়নের গতিকে মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প স্থাপনের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। তার জন্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পে প্রযুক্তির সংস্কার করতে হবে। টেকনলজির ক্ষেত্রেও এমন উপকরণগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে যার দ্বারা আমাদের গ্রামাঞ্চলের ঐ সব শিল্পের সমস্যা-সমাধানে সাহায্য হয়। গ্রামের বিদ্যালয়েও টেকনলজি শেখার বিভাগ খুলতে হবে। এই বিভাগে ছাত্রদের স্থানীয় শিল্প সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে হবে।

শিল্পগুলির মালিকানার রূপ কী হবে? গৃহ উদ্যোগের শিল্পগুলি ব্যক্তিগত অর্থাৎ পারিবারিক মালিকানায় থাকবে। কোন কোন শিল্পের মালিক হবে গ্রাম। সমবায় মালিকানাও থাকবে। লাভের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পরিচালিত ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগও থাকবে। এই সব শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন প্রভৃতি সমস্ত সুযোগ দেওয়া হবে। তার জন্য পুঁজিবাদী ধাঁচে পরিচালিত বৃহৎ শিল্পগুলিতেও কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও সীমা মেনে চলতে হবে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেখতে হবে যে সার্বজনীন নিগম বা কর্পোরেশনের পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্পের সংস্থা যেন বেশি হয়। এই সব সার্বজনীন কর্পোরেশনগুলির পরিচালনার বিষয়ে কর্মকুশলতা ও অপব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ অধ্যয়নের পর গণতান্ত্রিক নিয়ম ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

আজকের পরিস্থিতিতে কী শ্রমিক, মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের সম্মিলিত মালিকানা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায়? বৃহদাকারের শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের সম্মিলিত মালিকানার প্রয়োগ করা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তবে শ্রমিকরা ট্রাষ্টিরূপে যাতে উপভোক্তাদের, সমাজের এবং দেশেরও কল্যাণ দেখাশোনা করতে প্রস্তুত হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে যুগোস্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত, (একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ছেড়ে দিয়ে) সেখানে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা যদি আমরা অধ্যয়ন করি তবে তা আমাদের অনুকূল হবে।

যে সমস্ত বড় বড় শিল্পে আজ সার্বজনীন ও ব্যক্তি মালিকানা পাশাপাশি চলছে সেইগুলিকে একই অবস্থায় রেখে দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত শিল্পগুলিতে অধিক উৎপাদন এবং সেগুলির বিকাশে উৎসাহ দিতে হবে। সেগুলি যদি নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি অনুসারে চলতে প্রস্তুত থাকে

তবে তাদের উপর থেকে কণ্ট্রোল এবং লাইসেন্সের মতো অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া উচিত।

শিল্পগুলির পরিচালনায় শ্রমিকদের সহযোগ চাই। মজদুর সংঘগুলি তাদের প্রতিনিধিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এই কাজের জন্য যোগ্য করে তুলতে রাজী হলে তবেই তা সফল হবে।

পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া শিল্পগুলি যেন তার চারপাশের পরিবেশ সুন্দর ও পরিস্কার রাখার দিকে বিশেষ নজর দেয়। নতুন ঔপনিবেশিক শোষণের সমস্যা সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

এছাড়া রাজনৈতিক বিন্যাস, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ রচনা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমাজ-পরিবর্তন এবং নতুন সৃষ্টির গতিতত্ত্ব সম্পর্কেও লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ করিনি। তবে তা থেকে সম্পূর্ণ ক্রান্তির মৌল চিন্তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

আজ পর্যন্ত আমি যে আদর্শ পোষণ করে এসেছি তা থেকে এই চিন্তাধারা ভিন্ন নয়। নতুন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যে সব কথা আমি বিগত বৎসরগুলিতে বলেছি তা আজও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ও সঠিক রয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রান্তি সর্বোদয় থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সম্পূর্ণ ক্রান্তি ভাবনায় গ্রাম স্বরাজের ভাবনাও নিহিত আছে। এই সব ভাবনায় সম্পূর্ণ ক্রান্তির আদর্শের কিছু ঝলক পাওয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ ক্রান্তি সম্পর্কে পথের হদিশ মেলে।

এ কথাও আমি বলি, সম্পূর্ণ ক্রান্তি সম্পর্কে আমার কল্পনা পূর্বনির্দিষ্ট কোন ছক-এ বেঁধে দেবার মতো বিষয় নয়। মতবাদ এবং সিদ্ধান্তের গোঁড়ামী অতিক্রম করাও সম্পূর্ণ-ক্রান্তির একটি বৈচারিক বিষয়। কোন একজন লোকের কাছে সকল সমস্যার সমাধান থাকতে পারে না। সম্পূর্ণ-ক্রান্তির পূর্ণ রূপরেখা আজই দেওয়া সম্ভব নয়। চলার পথেই তা ক্রমশ পরিস্ফুট হবে।

গান্ধীজী বলতেন: One step is enough for me। সব কথা এক সঙ্গে চিন্তা করা যায় না। পরিস্থিতির মধ্য থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্ট হবে। বিনোবাজী বলেন যে পর্বতারোহনের সময় যখন আমরা একটি পর্বতের উপর উঠি, তখন তার থেকেও উঁচু আর একটি পাহাড় আমাদের চোখে পড়ে যেটিকে নিচে থেকে আগে দেখা যাচ্ছিল না। আবার সেই পর্বতের উপরে উঠলে তার থেকেও উঁচু পর্বত আমরা দেখতে পাই। সম্পূর্ণ

ক্রান্তি পর্বতারোহণের মতো এতে নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়

সার্বিক পরিবর্তন

আসলে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির কল্পনা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন। সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে, ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক সংগঠনগুলির চাল-চলন, কাজ-কর্ম, রীতি-নীতি সবকিছুতেই যেন পরিবর্তন আসে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা বা নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার কোন ব্যাপার নেই। এর লক্ষ্য ব্যবস্থা-পরিবর্তনের, পদ্ধতি-পরিবর্তনের এবং সমসমাজ গঠন।

সম্পূর্ণ ক্রান্তি সমগ্র জনতার ক্রান্তি। এই ক্রান্তির রণাঙ্গণ কেবল রাজধানী-গুলিতে সীমিত নেই। এর রণভূমি গ্রামে-গ্রামে ও শহরগুলিতে বিস্তৃত, প্রত্যেক কার্যালয়, বিদ্যালয় এবং কারখানায় এর পরিধি রয়েছে, এমনকি প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে। এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের সম্পূর্ণ ক্রান্তির সংগ্রাম করতে হবে। যেখানেই লোকেরা একে অপরের সঙ্গে বাস করে, কাজ করে, যেখানেই পারস্পরিক সম্পর্ক রচিত নয়, সেইসব স্থানই এই সংগ্রামের রণাঙ্গন। আবার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরেও এই রণভূমি, কেননা আমাদের তো জীর্ণ-পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে।

এই হোল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি। আমরা এক নতুন সমসমাজ গঠন করতে চাই। তার জন্য আমরা সরকারে এবং সমাজে, শিক্ষায় এবং নির্বাচনে, বাজারে এবং উন্নয়ন-পরিকল্পনায় অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চাই। যতক্ষণ না অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ বেকারী ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হবে না। যতক্ষণ না যৌতুক, 'হুণ্ডা,' 'বাঁকড়ো', 'পৈঠন' (মারাঠী ও গুজরাটি ভাষায় যৌতুক), অস্পৃশ্যতা, উচ্চনীচ ভেদাভেদ প্রভৃতির অবসান হচ্ছে এবং যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা উপরে উঠতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পারব সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, না পারব দুর্নীতি দূর করতে। নচেৎ শিক্ষায় ক্রান্তির উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ হবে না। এই সব সমস্যাই বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে। এই সবগুলির পরিবর্তন করতে না পারলে সম্পূর্ণ-ক্রান্তি কখনই সফল হবে না।

জাতিবাদ উচ্ছেদ

জাতিবাদ আমাদের কাছে অভিশাপ। এই জাতিবাদ লোকদের মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে এবং জনজীবনের প্রতি স্তরে দৃঢ়মূল। আমাদের

বর্তমান রাজনীতিও জাতি-প্রথাকে শক্তিশালী করার কাজ করছে। জানিনা এই জাতি-প্রথার মধ্যে কী এমন শক্তি আছে! ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে অথবা হয়তো তাঁরও আগে থেকে কত মহাপুরুষই না এই জাতি-প্রথাকে আঘাত করেছেন। তবু এর শক্তি আজও বিদ্যমান। এই জন্য আজ আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে জাতিবাদকে দূর করার কাজ শ্রেণী বিলোপের কাজের চেয়েও বেশি গুরুতর।

হরিজনরা আজও আলাদা বস্তীতে বাস করে, তাদের তথাকথিত 'গ্রাম সমাজের' বাইরের বলে গণ্য করা হয়। অস্পৃশ্যতা আজও তার ভয়ংকর রূপ নিয়ে উপস্থিত। বেশির ভাগ গ্রামে হরিজনরা উচ্চবর্ণ লোকেদের কুয়া থেকে জল নিতে পারে না, অথবা এক আধটি কুয়া তাদের জন্য আলাদা করে রাখা আছে। সেই কুয়াগুলি থেকে আবার উচ্চবর্ণ লোকেরা জল নিতে পারে না। আজ, এত বছর পরেও এই অবস্থা রয়েছে। যদি হরিজনরা মানুষের মতো বাঁচবার জন্য তাদের মাথা একটু উঁচু করেন তবে তার পরিণাম ভয়াবহ হয়। কখনও কখনও তো তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়।

আদিবাসীরাও অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন। মহাজন, জমিদার, এমন কি ছোট ছোট দোকানদাররাও আদিবাসীদের ভয়ংকরভাবে শোষণ করে, তাদের বরাবর ঠকাতে থাকে। বিহারের সমতলভূমিতে বসবাসকারী লোকেরা তো আদিবাসীদের মাল বইবার প্রাণীরূপে অর্থাৎ 'ডিক্কু' নামেই জানে।

সমাজ পরিবর্তনের এটিও এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু তথাকথিত উগ্রপন্থীদের মনও এদিকে বেশি আকৃষ্ট হয় না। তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী মনে করেন, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিতে এটিও বিপ্লবের পক্ষে একটি বড় শর্ত। আজ যখন আমরা সম্পূর্ণ ক্রান্তির জন্য বেরিয়ে পড়েছি তখন এই সব বিষয়েও সমাজে মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। উচ্চ-নীচের বিভেদ ঘোচাতে হবে। হরিজনরাও তো ঈশ্বরের সন্তান। যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরই হরিজনদেরও সৃষ্টি করেছেন। এই অবস্থায় আমরা উঁচু আর তারা নীচু, আবার নীচুর মধ্যেও তারা অস্পৃশ্য হয় কেমন করে? তারা কি এজন্য অস্পৃশ্য যে তারা আমাদের পায়খানা পরিস্কার করে? আজ সমাজে তাদের অবস্থা কী? তাদের মান নেই, সম্মান নেই! এদের সকলকে দলিত ও শোষিত রেখে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির কাজ হতে পারে না।

সমতা

ভগবান তো বলেছেন : চাতুর্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাভাগ : অর্থাৎ আমি গুণ-কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। তাহলে কেউ যদি নিজেকে খুব বড় পণ্ডিত মনে করে, কিন্তু তার গুণ কর্ম চামারের মতো হয় আর সে নিজেকে খুবই পূজণীয় বলে দাবি করে, তবে তা কেমন করে হবে ? দুরাচারী, অন্যায়কারী এবং লোভী হওয়া সত্বেও কেউ কীভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে ? কোন বিশেষ বংশে জন্ম গ্রহণ করার ফলেই কেন কেউ কপালে তিলক লাগাবার অধিকার পাবে ? কখনই না। মানুষের গুণ-কর্ম অনুসারে তার সম্মান হওয়া উচিত। আর অন্য সব বিষয়ে সব মানুষকে সমান বলে গণ্য করতে হবে। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। কেউ যদি শ্রেয় হন তবে তা তিনি হবেন তাঁর সৎচরিত্রের জন্য, তাঁর জাতের জন্য নয়। কেউ খারাপও হতে পারেন , তবে তিনি তা তাঁর জাতের জন্য হবেন না। তাঁর চরিত্রের জন্য। আমরা সমাজের ভাবনায়, তার মানসিকতায় এই রকম পরিবর্তন আনতে চাই। এই সব কথাই সম্পূর্ণ ক্রান্তিতে অবশ্যই আসবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদেব পবিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন হবে ব্যবস্থার মধ্যে, এবং ব্যক্তির মধ্যেও।

এইভাবে মানুষে-মানুষে যে বিভেদ তাকে দূর করতে হবে, জাতিভেদ, ছোঁয়া-ছুঁযি এই সব শেষ করে দিতে হবে। বিহার আন্দোলনের সময় আমি একথাও বলতাম যে উপবীতকে যদি উচ্চ জাতের প্রতীক বলে মনে করা হয় তবে তাও ফেলে দিতে হবে। ভারতবর্ষে এমন লোকের সংখ্যা বেশি যাদের উপবীত ধারণের অধিকার দেওয়া হয়নি। মহর্ষি দয়ানন্দ বেদের উল্লেখ করে দেখিযেছিলেন যে দ্বিজরা ছাড়া অন্য জাতের লোকেদেরও উপবীত ধারণের অধিকার আছে। এ সত্বেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব কিছুই বিপরীত হচ্ছে। অতএব জাতিবাদের সঙ্গে যুক্ত এই সব রীতির অবসান ঘটাতে হবে।

সম্পূর্ণ-ক্রান্তির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হবেন তাঁদের এই সবকিছু করতে হবে। প্রথমে তাঁদের নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ দূর করতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একতা রাখা যেতে পারে। বিজ্ঞান, প্রয়োগ বিদ্যা এবং শিল্পীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই রকম ছোঁয়াছুঁয়ির ভাবনা কম হতে থাকবে। আমরা যখন গ্রামে যাই তখন সাধারণতঃ আমরা সবর্ণ লোকেদের বাড়িতে শিবির করি। এটি খারাপ কিছু নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আমরা হরিজনদের ঘরেও

থাকতে শুরু করি এবং তাঁদের ওখানেও খাওয়া-দাওয়া করি। ব্রাহ্মণ, হরিজন প্রভৃতির সাথে সহভোজনের কর্মসূচী এই দিকে অগ্রসর হবার সহায়ক হতে. পারে। সংক্ষেপে, তাঁদের মনেও এই বিশ্বাস জাগানো দরকার যে, সম্পূর্ণ ক্রান্তি করার জন্য যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁদের অন্তর আমাদের সঙ্গে আছে এবং তাঁরা আমাদের বুকে নিয়ে আমাদের ওপরে ওঠাতে চান, তাঁরা আমাদের সেবা করতে চান। তাঁদের মধ্যে এই প্রভাব পড়া উচিত যে, এঁরা হলেন আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাল করাতে তাঁরা নিয়োজিত।

কু-রীতি এবং কু-প্রথার অবসান

জাতি প্রথার অবসানের জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ও মাধ্যম হতে পারে। বিশেষ করে যুবকদের উচিত তাদের মা-বাবাকে এই কথা ভালভাবে বোঝানো। তাঁরা যদি না বোঝেন, তবে তাঁদের রাজী না হওয়াকে স্বীকার করে নিয়ে এবং তাঁদের বিরোধিতা করে যুবকদের উচিত অন্য জাতে বিবাহ করা। এর মূল কথা হোল, উচ্চ-নীচের উপর আশ্রিত জাতি প্রথার অবসান ঘটানো। হিন্দু সমাজের এই কলঙ্ক ঘুচিয়ে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সমতাকে যেন স্বকীয় আচার হিসাবে গ্রহণ করি এবং নিজেদের জীবনে তা রূপায়িত করে দেখাই।

সদৃশভাবে, বিবাহ, জন্ম এবং মৃত্যুর সঙ্গেও কয়েকটি কু-প্রথা প্রচলিত আছে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তিতে এই প্রথাগুলিরও অবসান ঘটাতে হবে। সমাজের এই সব কু-রীতি, কু-প্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। বিবাহের মতো পবিত্র সংস্কারও বাজারের পণ্য হয়ে গিয়েছে-তিলক, যৌতুক, দৃশ্যা, বাঁকভো, পৈঠন প্রভৃতি কুপ্রথা উচ্চ পরিবারের প্রতিষ্ঠা এবং বংশমর্যাদার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। আইনও তার সামনে নিরুপায়। এ থেকে মুক্ত হবার একটি সক্রিয় পদক্ষেপ হোল, ঘরে ঘরে তরুণ তরুণীরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ জোরদার করুন। এর জন্য তরুণদের প্রহ্লাদের মতো নিজেদের মা-বাবার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না হলে সম্পূর্ণ-ক্রান্তি ফাঁকা আওয়াজই থেকে যাবে।

বিহার আন্দোলনের সময় আমি যুবকদের আহ্বান করে বলতাম যে আপনারা তো আজ সম্পূর্ণ-ক্রান্তির নামে আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে ধ্বনি দিচ্ছেন, কিন্তু যখন আপনাদের বিবাহ স্থির হবে এবং আপনাদের পিতৃদেব মেয়ের কাছে যৌতুক দাবি করবেন· তখন কি আপনারা তার

বিরোধিতা করবেন? যদি না করেন তবে ধিক আপনাদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিকে! সেক্ষেত্রে জানবেন, আপনাদের সব ত্যাগ ও বলিদান মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। আপনারা আপনাদের মা-বাবাকে স্পষ্ট বলে দিন যে আপনারা বাজারে বিক্রয়যোগ্য গরু-ঘোড়া নয় যে আপনাদের বিক্রি করা হবে, বাজারে আপনাদের দাম নীলামে ডাকা হবে! তেমনি মেয়েদেরও আমি বলতাম যে আপনাদের মধ্যে সেই সাহস থাকা উচিত, ছেলেদের তরফ থেকে যদি যৌতুক দাবি করা হয় তবে তাদের আপনারা স্পষ্ট বলে দেবেন যে এই রকম ছেলেদের আপনারা বিবাহ করবেন না।

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির কথা তো একটু মনে করুন। এখানে সীতা রামচন্দ্রকে বরমাল্য পরিয়েছেন। এখানে স্বয়ংবর হোত। মেয়েরা নিজেদের জন্য বর পছন্দ করত। তার বদলে আজ মেয়ের বাবারা ছেলেদের বাবার কাছে হাত জোড় করে থাকেন। আর ছেলের বাবারা বলেন, আমি তো প্রস্তুত, কিন্তু ছেলেকে আপনি একটু বোঝান। তখন মেয়ের বাবারা ছেলেকে গিয়ে ধরেন। তখন ছেলে বলে, আপনারা যদি আমাকে বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমি বিবাহ করব! আমাকে যদি একটি অ্যামবাসাডার গাড়ি দেন তাহলে আমি বিবাহ করি! এখন এই অভাগাকে প্রশ্ন করা যায় যে, আপনি কি মোটর গাড়ীর সঙ্গে বিবাহ করছেন, নাকি বিদেশ যাত্রার সঙ্গে এঁরা কি নিজেদের জন্য স্ত্রী পছন্দ কববেন, না মোটর?

এইভাবে কতই না বন্ধন এবং বিভেদ আমরা নিজেদের মধ্যে বপন করে রেখেছি। আমাদের এই সবগুলিকে ভাঙতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রন্তির আদর্শ আমাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গকে, প্রত্যেকটি তন্তুকে স্পর্শ করবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তিকারী পরিবর্তনের অর্থই হোল, সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গের পরিবর্তন, বিবাহ থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সঞ্চালন পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিবর্তন। এরই নাম হোল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি। বিহার-আন্দোলন চলার সময় দশেরা আর দীপাবলীতে আমি নিবেদন করেছিলাম পূজা প্রভৃতি যা করবার করুন, কিন্তু পূজার সঙ্গে তামাসার কোন সম্বন্ধ নেই। আজ এই সব পূজা-পার্বনে যেসব রেকর্ড বাজান হয় তার সঙ্গে পূজার কী সম্পর্ক! মা দুর্গার উপর যদি কোন গান, কোন ভজন-পূজন হয় তবে তার মানে বোঝা যায়। কিন্তু এখন তো শুধু সিনেমার গান বাজান হয়। এই কি আমাদের হিন্দু বা ভারতীর সংস্কৃতি? বন্ধুগণ, এই হোল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি।

এই ক্রান্তিতে, ঐ সব বিষয়ে ক্রান্তি হবে, তাতেও পরিবর্তন হবে। পূজার জন্য, পূজার মনোভাব থাকা দরকার। তামাসার মনোভাব নয়। অনুরূপভাবে বিয়ে-থা এবং ঐ জাতীয় ব্যাপারে ধনী-মানীরা এবং মন্ত্রীরা যে জাঁকজমক দেখান তাও বন্ধ করা উচিত। দেশে আজও যে দারুণ দারিদ্র্য রয়েছে, তা মনে রাখলে এই সব জিনিসকে কুৎসিত বলে মনে হবে।

শিক্ষার আমূল পরিবর্তন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হোল শিক্ষা। এখানে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির মাধ্যমে আমূল পবিবর্তন আনতে হবে। যা নৈতিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, শিক্ষার যা মূল তত্ত্ব তা সকল পরিস্থিতিতেই একই রকম থাকবে। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে আমরা পবিস্থিতি অনুসারে লোকেদের শিক্ষা দেব। প্রশ্ন হোল, সম্পূর্ণ-ক্রান্তির অনুকূল শিক্ষার স্বরূপ কী? জোড়াতালি দিয়ে কাজ হবে না। সমগ্র কাঠামো বদলাতে হবে।

বর্তমানের দূষিত-গলিত এবং অকেজো শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। আজকের শিক্ষা পদ্ধতি ত অধিকাংশ শিশুকে মুর্খ ও অজ্ঞানই রেখে দিচ্ছে। আমাদের দেশে আজও ইংবেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত। এখানে ওখানে সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দেশে সর্বজন-স্বীকৃত মত হোল যে শিক্ষায় প্রাথমিত স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। শিক্ষা-বিজ্ঞানীদেরও এই মত। কোঠারী কমিশনও এই কথা বলেছেন। তবু শিক্ষার ক্ষেত্রে কম কাজ এবং অল্প পরিবর্তন হয়েছে। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। তাদের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলে মনে হচ্ছে।

শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে। শিক্ষা লাভের পর বিদ্যার্থীরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজেরা যেন কিছু করতে পারে। আজকের শিক্ষায় কেবল ডিগ্রি বা উপাধি পাওয়া যায়। পরে ডিগ্রি নিয়ে চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর চাকুরী সকলে পাবে কোথায়? এই রকম অবস্থায় নিজেদের জীবন নির্বাহের কোন পথ শিক্ষিতেরা দেখতে পায় না। চীনে মাও যুবকদের বলেছিলেন, কারখানায় যাও, ক্ষেতে যাও। সেখানে গিয়ে কাজ শেখো, বোঝো। ঐগুলিই হোল তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। গান্ধীজীও এই কথাই বলেছিলেন যে শিক্ষা এমন হবে যাতে বিদ্যার্থী স্বয়ং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তার

বদলে আজ কেবল চাকুরী দাও, চাকুরী দাও, এই চিৎকার গুঞ্জরিত হচ্ছে এর অর্থ আমাদের দাসত্ব দাও, দাসত্ব দাও। এই হোল আজকের শিক্ষা।

আমি একথা স্বীকার করি যে যতক্ষণ না ডিগ্রি দেওয়া বন্ধ হচ্ছে, অথবা চাকুরীর বা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত ডিগ্রির সম্পর্ককে ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। আজকের অবস্থা হোল ছাত্র লেখাপড়া করুক বা নাই করুক, তার নামের পরে যদি বি. এ, এম. এ ডিগ্রি জুড়ে যায় তবে তাকে চাকরী পাবার উপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে। আর বেশির ভাগ লোক তো শেখবার জন্যে পড়ে না, বরং এইজন্য পড়ে যে ডিগ্রি পেলে চাকুরীর দরজা খুলে যাবে। এই জন্য এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে ভবিষ্যতে কেবল ডিগ্রিকে অবলম্বন করে চাকুরী পাওয়া যাবে না। যেখানে যে কাজেব জন্য চাকুরী দেওয়া হবে তার জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাহলে হয়তো এমনও হবে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপডা করেনি এমন কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং যে বিশ্ববিদ্যালযে শিক্ষাপ্রাপ্ত হযেছে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত চাকুরী আর ডিগ্রির মধ্যেকার এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ডিগ্রির প্রতি এই মিথ্যা মোহ দূর করা যাবে না।

এজন্য আমার পরামর্শ, চাকুরীদানের ক্ষেত্রে-তা সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক, তারা যেন কাজের হিসেবে স্বয়ং পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করে। কাজে নিযুক্ত করাব পর তারা প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষণ অথবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেবল এই রকম প্রমাণ-পত্র দেওয়া যেতে পারে যে ছাত্র কত বছর কলেজে ছিল, শ্রেণীতে সে কত ঘণ্টা কাজ করেছে, এবং দোকান, কারখানা, কার্যালয়, কৃষি প্রভৃতিতে সে মোট কতটা এবং কেমন কাজ করেছে এবং কী কী বিষয়ে তার আগ্রহ। চাকুরীপ্রার্থীর যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতা যাচাইয়ের কাজ চাকুরী যে দেবে তার থাকবে।

এমন ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে ন্যূনতম শিক্ষা সকলে পায় এবং অজ্ঞানতা এবং নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়। শিক্ষার পদ্ধতি এমন হবে যার দ্বারা বিদ্যার্থীর বুদ্ধির বিকাশ হবে এবং তার মধ্যে এমন শক্তি বিকশিত হবে যাতে সে নিজের বুদ্ধিতে যে কোন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবে। যদি শিক্ষার ফলে এই ধরণের শক্তি পরিস্ফুট না হয় তবে সেই

শিক্ষাকে অকেজো বলে গণ্য করতে হবে। শিক্ষিত মানুষ এমন হবে যাতে সে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু বুঝতে এবং চিন্তা করতে পারে।

আজকালকার শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবেই এই কথা স্বীকার করছেন যে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের হাতে কাজ করার শিক্ষাও দিতে হবে। মাথা এবং হাত দুটিই যেন কাজ করে। এর অর্থ হোল শিক্ষাতে শ্রমেরও যেন ভাল স্থান থাকে। শহরে শিক্ষার স্বরূপ হবে এক রকম, গ্রামে হবে অন্য রকম। কিন্তু শিক্ষায় শ্রমেরও স্থান থাকবে। এই দিকে নয়ী তালিমের কয়েকটি সংস্থা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা অনুকরণ করা যেতে পারে। 'হাফ-হাফ স্কুল' অর্থাৎ অর্ধেক সময় লেখাপড়া এবং অর্ধেক সময় কাজ, অথবা এক ঘণ্টার বিদ্যালয়ের কথাও ভাবা যেতে পারে।

গ্রামে কেমন শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। যাকে প্রকৃতপক্ষে গ্রামশালা বলা যায় তা-ই গ্রামে চালাতে হবে। আজ তো শহরের বিদ্যালয় এবং গ্রামের বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গ্রামের মা-বাবা অথবা অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের যে পাঠশালায় পাঠান তার মূলে এই উদ্দেশ্য থাকে যে লেখাপড়া শেখার পর তাঁদের ছেলেরা গ্রামের বাইরে যেন এমন চাকুরী পায় যাতে তাদের কোন শারীরিক শ্রম করতে না হয়। অবশ্যই গ্রামের এবং শহরের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা পাবার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যাতে শেষ পর্যন্ত গ্রামে সেই সব লোকই থাকে যারা লেখাপড়া জানেন না, আর বাকি সব লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। সেই সঙ্গে গ্রামের লোকদেরও শেষ পর্যন্ত এই কথা বুঝতে হবে যে গ্রামের সকল যুবক গ্রামের বাইরে গিয়ে তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে, এমন অবস্থা কখনই সম্ভব নয়। এইভাবে ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম কখনই উন্নত হতে পারবে না।

সুতরাং, প্রকৃত গ্রামশালা হবে সেইটি যেখানে গ্রামের শিশু, বালক, কিশোর, যুবক এবং প্রৌঢ় সবাই শিক্ষালাভ করতে পারবে। তার পাঠ্যক্রম আজকের পাঠ্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এই গ্রামশালা পরবর্তী কালে উচ্চতর শিক্ষা পাবার জন্য প্রস্তুত করিয়ে দেবার বিদ্যালয় হবে না। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে ; অর্থাৎ এই গ্রামশালা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যত জ্ঞান ও যত রকম শিক্ষা আছে তা পুরাপুরি দেবার পক্ষে উপযুক্ত হবে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম থাকবে। তার ফলে গ্রামগুলিতে বেশি করে

ভাল কৃষক, ভাল কারিগর, গ্রামের কাজ ভালভাবে করতে পারে এমন লোক গ্রামের মধ্যেই সৃষ্টি হবে। গ্রামে বসবাসকারী কিষান, মজতুর, কারিগর, মহিলা প্রভৃতি সকলকেই একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা পেতে হবে। তার ফলে তারা পরিপূর্ণ এবং সুখী ও সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারবে।

সংক্ষেপে, শিক্ষার সমগ্র কাঠামো এমনভাবে নতুন করে তৈরী করতে হবে যাতে দেশের সমস্যাবলীর সঙ্গে তার সোজাসুজি যোগ থাকে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং যুবকদের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা করতে হবে, তা না হলে শিক্ষায আমূল পরিবর্তনের কোন অর্থ থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিদ্যার্থীবা বই খুলে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখলে কেউ যদি তা ধরে ফেলে বাধা দেন তবে তাঁকে ছুরি দেখানো হয়ে থাকে—তাহলে এ কেমন ক্রান্তি? আপনারা নিজেরাই বেইমান হবেন, আর অন্যকে বলবেন সৎ হতে? এতে কোন কাজ হবে না। আপনারা যদি পরীক্ষায় চুরি করেন, এবং নিজেদেব জোবে নম্বর বাডান তবে আপনাদের মধ্যে পরিবর্তনকারী শক্তি কোথা থেকে আসবে? বিদ্যার্থীদের স্বৈরতন্ত্র আমরা আনতে চাই না। এমন কোন কথা নেই যে বিদ্যার্থী, যুবকেরা যা বলবেন তাই করতে হবে। তাঁদের নিজেদেরও গণতন্ত্রের পদ্ধতিকে অনুশীলন করতে হবে।

যখন বিহারের আন্দোলন চলছিল তখন অনেকেই আমাকে বলেন যে আন্দোলনের নতুন হাওযার ফলে পাটনা প্রভৃতি শহরে 'ঈভটিজিং' অর্থাৎ মেয়েদের বিরক্ত করার ঘটনা কমেছে। এইরকম চারিত্রিক পরিবর্তন আমাদের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ক্রান্তি আনতে হবে। আর তার জন্য সংঘর্ষের স্বরূপ কেবল বাইরেই থাকবে না, তা ভিতরেও থাকবে।

রচনা ও সংঘর্ষ

এইভাবে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির সৈনিকদের তাঁদের সংঘর্ষ নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে; বরাবর সংগ্রাম করে যেতে হবে এবং তারই সাথে সাথে গঠনাত্মক এবং সৃজনাত্মক কাজ করে যেতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তিকে সফল করার জন্য সংঘর্ষ এবং গঠন, এই দ্বি-স্তরীয় প্রক্রিয়া প্রয়োজন। স্বভাবতই গঠনমূলক কাজ অপেক্ষা সংঘর্ষমূলক কাজের আকর্ষণ বেশি। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে গঠনমূলক এবং সংঘর্ষমূলক কাজ পৃথকভাবে চলতে পারে না।

সংঘর্ষ ছাড়া গঠন হতে পারে না, কেননা গঠনের মধ্যে পরিবর্তন অথবা ক্রান্তি নিহিত। এইভাবে পরিবর্তন এবং ক্রান্তির মধ্যেও গঠনকর্ম নিহিত। তাই আমি বলব যে কেউ যদি মনে করেন যেহেতু আন্দোলন শান্তিপুর্ণভাবে চলছে অতএব তা ক্রান্তিকারী নয়, তবে তিনি তাঁর অবিমৃষ্যকারী বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। আমাদের একথা মনে করা উচিত নয় যে যতক্ষণ না টানাটানি হুড়োহুড়ির কাণ্ড ঘটছে, অর্থাৎ জেলে যাবার কর্মসূচী শুরু হচ্ছে ততক্ষণ সম্পূর্ণ-ক্রান্তি হচ্ছে না।

এমন হতে পারে যে আমাদের কাজে বাইরের আড়ম্বর, প্রদর্শন প্রভৃতি থাকবে না। হতে পারে যে কখনও হয়তো এই কাজ সম্পূর্ণ শান্তভাবে হবে! কিন্তু এর মধ্যে একটি বড় কথা হোল এই যে এই ধরণের কাজই জনসাধারণের মধ্যে বেশি লোক করতে পারে, কৃষক তার গ্রামে বসে করতে পারে। গ্রামের বাবুরা যদি তাঁদের চাকরদের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার বন্ধ করে দেন, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও নীচ ভাষায় কথা বলা বন্ধ করে দেন, তবে তাও সম্পূর্ণ-ক্রান্তিরই একটি কাজ হবে।

আজ তো এমন অবস্থা যে প্রতি বছর আমাদের দেশে দারুণ শীতে শত শত লোক ঠাণ্ডায় মারা যায়। তাহলে কি করে বলা যাবে যে সম্পূর্ণ-ক্রান্তি হয়েছে? এই ঘটনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের আরও কতদূর কাজ করতে হবে তারই নিদর্শন। এই রকম অবস্থায় আমাদের যেসব মানববন্ধু সবার পিছনে পড়ে রয়েছে, তাদের গায়ে একটা করে কম্বল দেওয়াও সম্পূর্ণ-ক্রান্তির পথে একটি পদক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে যে বহুবিধ বিভেদ রয়েছে তার উল্লেখ আমি করেছি। আমাদের কাছে কোন বিভেদই মঙ্গলকারী নয়। আমাদের দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই সমান। আমাদের একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হবে। এখনও তো মানুষে-মানুষে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তা দূর করতে হবে। তার জন্য যে পদক্ষেপ তাও হবে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির পথেই পদচারণা।

অনুরূপভাবে, মনে করুন একটি তেজস্বী বালক আছে। কিন্তু তার জন্ম হয়েছে একটি গরীব চাপরাসির ঘরে। এই জন্য সে বেশি পড়াশোনা করতে পারে না। অল্প বয়সেই তাকে কোন কাজে লেগে যেতে হয়। অন্য দিকে ধনীর ঘরের একটি ছেলে আছে। তার বুদ্ধি কম, তাকে পড়াশোনা করালে

সমাজের কোন লাভ হবে না। কিন্তু পয়সার জোরে সে অনেক দূর পড়া-শোনা চালিয়ে যাবে। যতদিন পর্যন্ত ওই অবস্থা থাকবে, ততদিন কেমন করে বলা হবে যে শিক্ষায় ক্রান্তি হয়েছে?

মানবিক আধ্যাত্মিকতা

সাধারণত আমি অধ্যাত্মের কথা বলি না। কিন্তু অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, গরীবদের জন্য কিছু করার প্রেরণাকেও আধ্যাত্মিকতা বলা যেতে পারে। আমার কাছে আপন-পরের বিভেদ দূর করাই সব চেয়ে বড় ধর্ম। সমাজের এবং গ্রামের জীবনে এইটিই অধ্যাত্মের মূল শর্ত হতে পারে। অথবা যাঁরা এক সঙ্গে থাকেন, অন্ততপক্ষে গ্রামবাসীরা একে অপরের জন্য চিন্তা করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজন হলে একে অপরের জন্য ত্যাগ করবে। আমার সুখের ভাগী হবে অন্যে। অন্যের দুঃখের ভাগী হব আমি। ব্যক্তির জন্য, সমাজের জন্য এটিকে আধ্যাত্মিক মূল্য বলে মনে করতে হবে, মনে করতে হবে মানবিক মূল্য বলে।

একবার আমি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন গিয়েছিলাম। সেই সময় সেখানে আমি দেখেছিলাম যে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা হোল যে তাঁরা খেতে বসার আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন যে কেউ অভুক্ত আছে কিনা! এটি হোল এক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে এই ধরণের সমাজ-ধর্মের প্রচলন করতে হবে। সকলের মধ্যে যেন এই চিন্তা জাগ্রত থাকে যে সমাজে কেউ না খেয়ে থাকবে না। মানুষের মধ্যে যে লোভ, মোহ এবং স্বার্থ রয়েছে তাকে দূর করতে পারলেই প্রকৃত ক্রান্তি হবে। গান্ধীজী সব সময় এই বিষয়ে জোর দিতেন যে ক্রান্তি দ্বি-স্তরীয় হওয়া উচিত, অন্তরের এবং বাইরের এবং তার শুরু অন্তর থেকেই করতে হবে।

সম্পূর্ণ-ক্রান্তিতে এই সব কথাই এসে যায়। প্রকৃতপক্ষে যারা দলিত মানুষ, তাদের মধ্যে যেন এই প্রতীতি জাগ্রত হয় যে তাদের জন্য এক নতুন দিনের সূচনা হয়েছে। যারা সব চেয়ে গরীব এবং অসহায় তাদের কথাই সকলের আগে চিন্তা করা হবে, তাদের কল্যাণও সকলের আগে করা হবে—এইটিই হোল প্রকৃত ন্যায়। আমাদের প্রত্যেকটি কাজকে এই মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তির এই বিচার আমাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। কেবল বিচার ছড়িয়ে দেওয়াই নয়, উপরন্তু লোক শক্তির দ্বারা গ্রামের এবং সমাজের কাঠামো বদলানোর কাজও করতে হবে।

এই কাজ আমরা প্রেমপূর্বক বুঝিয়ে সুঝিয়ে করব এবং প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহের সাহায্য নেব। কিন্তু সত্যাগ্রহ তখনই হবে যখন অন্য সব উপায় পথ আমাদের প্রযোগ করা হয়ে যাবে এবং নতুন কোন পথ আমাদের গোচর হবে না। ঐ পরিস্থিতিতে অনিবার্য হোলে শান্তিপূর্ণ সংঘর্ষ শুরু করতে হবে।

মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এত প্রশ্ন এবং এত সমস্যা রয়েছে যে সেগুলির সমাধান খোঁজার কাজ কখনই শেষ হতে পারে না। কিন্তু এত সব কাজ কে করবে এবং কবে করবে তা ভেবে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। নইলে আমাদের অবস্থা সেই জোলার মতন হবে যে এক জাহাজ-ভর্তি তুলো দেখে ভাবতে বসেছিল, সে এত তুলো কি ধুনতে পারবে! আর ভাবতে ভাবতে সে পাগল হয়ে গেল। আমাদেরও এই অবস্থা হতে পারে। সেজন্য আমরাই সব কিছু করে দেব এই রকম অহঙ্কার মন থেকে দূর করে আমাদের উচিত একাগ্রতার সঙ্গে এবং নিষ্ঠাপূর্বক মৌলিক কাজে লেগে থাকা। এই রকম কাজে তো ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, কিছু বিশেষ প্রসঙ্গ এবং অন্য প্রকারের শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় বড কাজে ইতিহাসই তো সাহায্য করে থাকে। আমাদের কেবল 'ক্যাটলেটিক এজেন্ট' হয়ে থাকতে হবে। জানি না, ইতিহাসের সাহায্য কবে এবং কী ভাবে সৃজনশীল হবে। কিন্তু সময় যখন হয়, ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে তখন নতুন শক্তির এমন এক জোযার আসে যে তার ধাক্কায় পরিবর্তনের রথ অনেক দূর এগিযে যায। সম্পূর্ণ ক্রান্তির সৈনিক এই ক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে চান করুন, কিন্তু তাঁকে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে।

আসল কথা হোল, ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে এক সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন গুজরাট সৃষ্টি করতে হবে, নতুন বিহার সৃষ্টি করতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তির দ্বারা প্রকৃত স্বরাজ আনতে হবে, যে স্বরাজের জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ আত্মাহুতি দিয়েছেন, যে স্বরাজের জন্য ভগৎ সিং ও তার মতন অন্যান্য বিপ্লবীরা গুলির মুখে দাঁড়িয়েছেন অথবা ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেছেন, যে স্বরাজের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

নিষ্কাম লোকসেবক

এই রকম সম্পূর্ণ-ক্রান্তির জন্য আমাদের এমন লোক প্রয়োজন যাঁরা নিষ্কাম হয়ে জনগনের মধ্যে কাজ করবেন এবং জনগণকে জাগ্রত করবেন। এই কাজে

রাষ্ট্র যতটা সাহায্য করতে পারে তা করুক। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে প্রধানত এই কাজ কর্মীদের, ক্রান্তিতে বিশ্বাসবান তরুণদের এবং জনগণের। জন-ক্রান্তি জনগণের সহযোগিতায় এবং তাদের দ্বারাই হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তি রাষ্ট্রের শক্তিতে হবে না, তা হবে জনগণের শক্তিতে। এই কাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতাদের ভাষণে বা আবাহনে হতে পারে না। এই ধরণের পরিবর্তন কেবল সেই সব লোক-নেতা ও লোক-সেবকদের দ্বারা হওয়া সম্ভব যাঁরা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের পদ থেকে দূরে থেকে জনতায় মধ্যে পৌঁছেছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে কাজ করছেন।

এই জন্যই গান্ধীজী লোকসেবক সংঘের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কংগ্রেসের রূপান্তর হোক এবং সেটি সেবকদের একটি জমায়েত রূপে গড়ে উঠুক। মনে রাখবেন এটি হবে সেবকদের জমায়েত, সেই সব শাসক ও ক্ষমতাকাঙ্খীদের জমায়েত নয় যাঁরা বলবেন, 'আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও, আমাদের গদীতে বসাও, তাহলে আমরা তোমাদের সব কিছু করে দেব'। জনগণকে নিরুপায়, দীন এবং পরাবলম্বী করে তুলতে এঁর চেয়ে বড় আর কিছুর প্রয়োজন নেই। সেই জন্যই গান্ধীজী বলেছিলেন, এখন আমাদের শাসকদের জমায়েতের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন সেবকদের জমায়েতের।

এটি বোধহয় স্বাভাবিকই ছিল যে স্বাধীনতার পর জনগণের সেবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা দেশ সেবার দৃষ্টিতে ক্ষমতার পিছনে দৌড়বেন। কিন্তু আমি মনে করি যে এখন এত দিন পরে 'ক্ষমতার মাধ্যমে সেবা' এই আদর্শের ব্যর্থতার ও অসারতার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। এজন্য এখন সেবার দৃষ্টিতে আগ্রহী দেশপ্রেমিকদের অধিকতর সংখ্যায় সামাজিক ক্রান্তির ক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আজ দেশে এই ধরণের শত শত সহস্র সহস্র লোক সেবকের প্রয়োজন। সেবকদের এমন এক সেনাবাহিনী সৃষ্টি করতে হবে যাঁরা নব জাগৃতির বাণী নিয়ে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেন। তাঁদের মনে লোকসভা অথবা বিধানসভায় যাবার মোহ যেন সৃষ্টি না হয়। তাঁরা পঞ্চায়েতেও যেতে চাইবেন না, মিউনিসিপ্যালিটিতেও যেতে চাইবেন না। তারা জনগণের কাছে ভোট চাইতেও যাবেন না, তাদের সেবা করবার জন্যই তাদের কাছে যাবেন। এবং ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গ্রামে দেশ গঠনের বাণী পৌঁছে দেবেন।

যুবসমাজ

আমাদের দেশের যুবকদের কাছে একটি খুবই বড় দায়িত্ব এসেছে। সেটি হোল এই যে ক্রান্তিকে সফল করার জন্য তাঁদের নিজেদের জীবনকে কাজে লাগাতে হবে। ইংরেজ রাজত্বের সময় উৎসাহী যুবকেরা সরকারী চাকুরীতে যেতে অস্বীকার করতেন। তাঁরা বড় বড় বেতনের এবং উঁচু পদের মোহকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। কিন্তু আজ তো আমাদের যুবকদের কাছে চাকুরীই প্রধান আকর্ষণ হয়ে রয়েছে। এটি কোন দোষ বা ত্রুটি না। তবু তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি হৃদয়বান এবং কম আত্মকেন্দ্রিক, তাঁদের বোঝা উচিত যে দৈনন্দিন সরকারী কাজ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তার দ্বারা দেশ গঠন হতে পারে না। যাঁদের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা আছে, তাঁদের বোঝাতে হবে যে বিধানসভা এবং সরকার দেশ গঠন করতে পারে না। এই কাজের জন্য জনগণকেই জাগ্রত করতে হবে। তার জন্য সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হোল লোকেদের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গে বাস করা এবং তাদের আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করা।

কোটি কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট আমাদের এই দেশে এই কাজের জন্য কয়েক হাজার ভাই বোন কি এমন পাওয়া যাবে না, যারা এই মৌলিক কাজ করবার জন্য যথেষ্ট ত্যাগী, সাহসী এবং দূরদর্শী হবে? তরুণেরা তাদের হৃদয় মন্থন করুক। তাদের কি আরামের সুকুমার জীবন পছন্দ? তারা কি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষের প্রতিযোগিতায় নিজেদের যুক্ত করতে চায়? যারা এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়, তারা শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঁধে চেপে বসে। আমি আশা করি যে এই দেশে এমন অনেক তরুণ আছে যারা এক মহান আদর্শের জন্য কষ্টকর এবং বিপদসঙ্কুল জীবন সহাস্যে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। আমাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্বও এই রকম এক অভিনব ক্রান্তির জন্য আমাদের আহ্বান করছে।

এই-যে চ্যালেঞ্জ, তার জবাব দেবার দায়িত্ব যুবকদের। এই দেশের অধ্যাত্ম বৃদ্ধদের বিষয় নয়, তা যুবকদেরই। হৃষিকেশ যখন জীবনের কুরুক্ষেত্রে অনুপম অধ্যাত্মের পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়েছিলেন তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যুবক। তখন তিনি ভারতের উৎকৃষ্ট তারুণ্যের রথের সারথী হয়েছিলেন। নিজের প্রিয়তমার কোলে নবজাত রাহুলকে ঘুমন্ত অবস্থায় ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন অদ্বিতীয় সাংস্কৃতিক ক্রান্তির পথে বেরিয়েছিলেন

তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তরুণ। অদ্বৈতের অন্যতম সংস্কারক শংকর যখন তাঁর দিগ্বিজয় যাত্রা আরম্ভ করেন তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, তিনিও ছিলেন তরুণ। বিবেকানন্দ যখন চিকাগোর মঞ্চে বেদান্তের সার্বভৌম ধর্মের ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনিও বৃদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন তরুণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষের দাবানলে লাফিয়ে পড়ে গান্ধীজী অধ্যাত্মের নিজস্ব আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন তখন তিনি বৃদ্ধ নয়, যুবকই ছিলেন। অধ্যাত্ম বৃদ্ধাবস্থার কোন প্রকৃতি নয়, তা হোল তারুণ্যের অত্যুচ্চে উল্লম্ফন।

লোকনীতি

অতএব এই কাজে যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। চাকুরীর, পদ অধিকারের এবং রাজনীতির উচ্চাকাঙ্খাগুলি ত্যাগ করে তাদের এই মৌলিক কাজে লেগে যেতে হবে। কল্যাণের যে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে, যে রকম মানবতাবাদী সমাজ গঠন করতে হবে, তা আজকের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান রাজনীতির প্রতি যাঁরা আশা পোষণ করেন তাঁরা তো শুকনো হাড় চোষেণ এবং নিজেদের রক্তের স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হন। আজকের রাজনীতি ভেঙ্গে পড়ছে, তা আরও ভাঙ্গবে এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তখন তার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন ভিত্তিতে নতুন রাজনীতির সৃষ্টি হবে। সেই রাজনীতি হবে সম্পূর্ণ আলাদা। তা রাজনীতি হবে না, হবে লোকনীতি। তার সৌধ উপর থেকে নয়, নীচে থেকে নির্মিত হবে। দিল্লী থেকে নয়, গ্রামগুলি থেকে মহল্লাগুলি থেকে তার ইঁট গাথা হবে। তার জন্য কোন এক নতুন দলকে গদীতে বসিয়ে দেওয়াটাই পর্যাপ্ত নয়। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নবীনতম কোন নেতার আবির্ভাবও তার জন্য যথেষ্ট নয়। এই লোকনীতি লোকশক্তির গর্ভ থেকেই জন্ম লাভ করবে।

ভারতবর্ষের মাটিতে এই লোকনীতির বীজ অনেক গভীরে চাপা পড়ে রয়েছে। গান্ধী এই বীজটির সৃষ্টি করেছিলেন। আর বিনোবা তাঁর পদযাত্রার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভূমিতে তাকে বপন করেছেন। হাজার হাজার সেবক এই বীজে জল সিঞ্চন করেছেন। আর হাজার হাজার লোক এই বীজ থেকে অঙ্কুরিত সম্পূর্ণ-ক্রান্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তার স্বপ্ন আমি আজও দেখছি। এবং আজ আমি এই রকম একাগ্রচিত্ত যুবকদের সন্ধানে রয়েছি যারা এই স্বপ্নকে সাকার করতে পারবে।

নিরন্তর-ক্রান্তি

সম্পূর্ণ-ক্রান্তির এই আন্দোলন সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। তার জন্য নতুন শক্তির প্রয়োজন। গ্রাম থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রাম, শহর, বিদ্যালয় এবং কারখানা থেকে এমন লোকেদের এগিয়ে আসতে হবে যাঁরা সম্পূর্ণ-ক্রান্তির মূল্য স্বীকার করবেন, গণতন্ত্রে এবং নাগরিক স্বাধীনতায় সৎনিষ্ঠ হবেন এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নতুন ভারতবর্ষ গঠনে তাঁদের পুর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে প্রস্তুত হবেন। প্রত্যেকটি গ্রামে, এবং এক একটি গ্রামে দুজন চারজন করে এই রকম যুবকদের বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলেই একটি জোরদার আন্দোলন দাঁড করান যাবে। তার জন্য গ্রামে গঞ্জে গিয়ে লোকদের সম্পূর্ণ-ক্রান্তির আদর্শ বোঝাতে হবে। এই আন্দোলনকে বর্ধিত করতে এবং তাকে গতিশীল রাখার জন্য গণ-সংগঠন তৈরী করতে হবে। এই আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত হবেন তাঁরা জাতি-ব্যবস্থায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের সম্পর্কে এবং জীবনেব অনুরূপ কোন না কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির লক্ষ্যাভিমূখে কিছু না কিছু কাজ করতে থাকবেন, এবং সেইসব কাজের সমন্বয়ও করা হবে।

আমি সব সময় বলে আসছি যে, এই সম্পূর্ণ-ক্রান্তি নিরন্তব বহমান এক ক্রান্তি। নিরন্তর যে ক্রান্তি তা কোথাও কখনও শুরুও হয় না, শেষও হয় না। সম্পূর্ণ-ক্রান্তি সম্পর্কে এটাই আমার কল্পনা। এটি এক অখণ্ড ধারা, একটি প্রবাহ। আমার কল্পনা হোল অবিরত ক্রান্তির, কন্টিন্যুযিঙ রেভলিউশন'-এর। সম্পূর্ণ-ক্রান্তি অবিরত চলতে থাকবে, তা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে পরিবর্তিত করতে থাকবে। পরিস্থিতি অনুসারে তার স্বরূপ বদলাবে, তার প্রক্রিয়া বদলাবে। এই ক্রান্তিতে কোন বিরাম নেই।

আমরা এই যে অভিনব সাংস্কৃতিক ক্রান্তি করতে চাই, সেই ক্রান্তি সম্পূর্ণ না হলে ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয়তাকে রক্ষা করা কঠিন হবে বলে মনে হয়। কিন্তু এই মানবিক ক্রান্তি অবশ্যই হবে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার সুর অনুরণিত হবার এই ক্রান্তি হবেই হবে। সেই অবস্থায ব্যক্তি সমাজের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ব্যক্তি বাঁচবে সমাজের জন্য, সমাজ বেঁচে থাকবে ব্যক্তির জন্য। আমাদের এই অভিনব সাংস্কৃতিক ক্রান্তি হবে আরোহণের একটি প্রক্রিয়া।